ভারত আমার

অমরনাথ রায়



বিদ্যাভারতী ● ৮-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :
শ্রীব্রজ রায়চৌধুরী
গ্রন্থ সজ্জা
শ্রীব্রজ রায়চৌধুরী ● শ্রীযুধাজিৎ

প্রকাশক
শ্রীঅধীরচন্দ্র পাল
বিদ্যাভারতী
৮-সি, ট্যামার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫, রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

ভারত আমাদের দেশ। এ দেশকে জানা ও চেনা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু এই বিশাল দেশের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিতে গেলে বিরাট কলেবর একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মেটানো সহজ কথা নয়। তাই ভারত সম্বন্ধে যেটুকু জানা একান্ত দরকার তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রচনা করেছি 'ভারত আমার'।

ছোট-বড় নির্বিশেষে ভারতের নাগরিকগণ যদি এ গ্রন্থ পাঠে নিজের দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, জানতে পারেন এ দেশের অতীত গৌরবের কথা আর গ্রহণ করেন ভবিষ্যতের সুন্দর ভারত গড়ে তোলার সংকল্প, তবেই আমার এ গ্রন্থ রচনার শ্রম হবে সার্থক।

অমরনাথ রায়

অনুসরণী



জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিচয়

আমরা ভারতবাসী। ভারতভূমি আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের স্বর্গ। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

দেবি আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার—আমার দেশ।

এ দেশের প্রতিটি মানুষ আমাদের প্রিয়। প্রতিটি জিনিস আমাদের প্রিয়। প্রিয় এ দেশের প্রতিটি ধূলিকণা। তাই দেশ-মাতাকে সবার আগে আমরা প্রণতি জানাই ঃ

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। অতি সুন্দর দেশ। ভারতের মাঠে হাওয়ায় দোলে সোনালী ধান। ভারতের বুক চিরে ছোট-বড় কতো নদী বয়ে চলে। কোথাও পাহাড়—চূড়া তার বরফে ঢাকা। কোথাও মরুভূমি—শুধু বালি আর বালি; সেখানে বৃক্ষলতা নেই, নেই জন-মানব। কোথাও সমতল ক্ষেত্র—ফুলে-ফলে-শস্যে ঝলমল করছে। কোথাও গভীর বন—হরেক রকম জন্তু-জানোয়ারের বাস সেখানে। ভারত কোথাও রুক্ষ, কোথাও বা কোমল সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা। কোমলে-কঠোরে মিলিয়ে সুন্দর রূপ এ ভারতের।

ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। এ দেশের মাটিতে হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি। কয়লা, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, পেট্রোলিয়াম—সবই আছে এ দেশে। আছে পর্যাপ্ত পরিমাণেই।

আমরাও সংখ্যায় নেহাৎ কম নই। প্রায় পঞ্চান্ন কোটি। এই পঞ্চান্ন কোটি মানুষও ভারতের এক বড় সম্পদ। চেহারায়, চাল-চলনে, ভাষায়, ধর্মে, পোষাক-পরিচ্ছদে আমরা আলাদা বটে, তবুও আমরা এক। একটি মাত্র আমাদের পরিচয়—আমরা ভারতবাসী।

ভারতের মাটি আমাদের ভাত-কাপড় যোগাচ্ছে। ভারতের মাটির নীচের সম্পদ আমাদের অর্থ এনে দিচ্ছে। ভারতের আলো আর বাতাস আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই ভারতের পরিচয় সবার আগে আমাদের জানা দরকার।

আমাদের সংবিধানে এ দেশের নামকরণ করা হয়েছে 'ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া'। নামকরণ ১৯৫০ সালে হলেও এ নাম দুটি কিন্তু মোটেই নতুন নয়, বহু প্রাচীন। ইণ্ডিয়া বা ভারত নামের দেশটির অবস্থান সম্পর্কে অনেক প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়। সে সব খুবই জটিল।

আমাদের মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে ভারতকে একটি দেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় 'বর্ষ' নামে একটি শব্দ আছে। শব্দটির একটি অর্থ—পাহাড় ঘেরা স্বতন্ত্র ভূখণ্ড। কাজেই ভারতবর্ষ অর্থে হয়—ভারত দেশ। বিষ্ণুপুরাণে আছেঃ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে দেশটি আছে তার নাম ভারত। সেখানে ভরত রাজার বংশধরেরা বাস করেন।

গ্রীসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন হেরোডোটাস। তিনি তাঁর গ্রন্থে পারসিক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম অংশ হিসাবে ইণ্ডিয়ার উল্লেখ করেছেন। এমনি আরও অনেক প্রাচীন নথি-পত্রে ভারত বা

ইণ্ডিয়া নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তা থেকে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রকৃত রূপ কল্পনা করা যায় না।

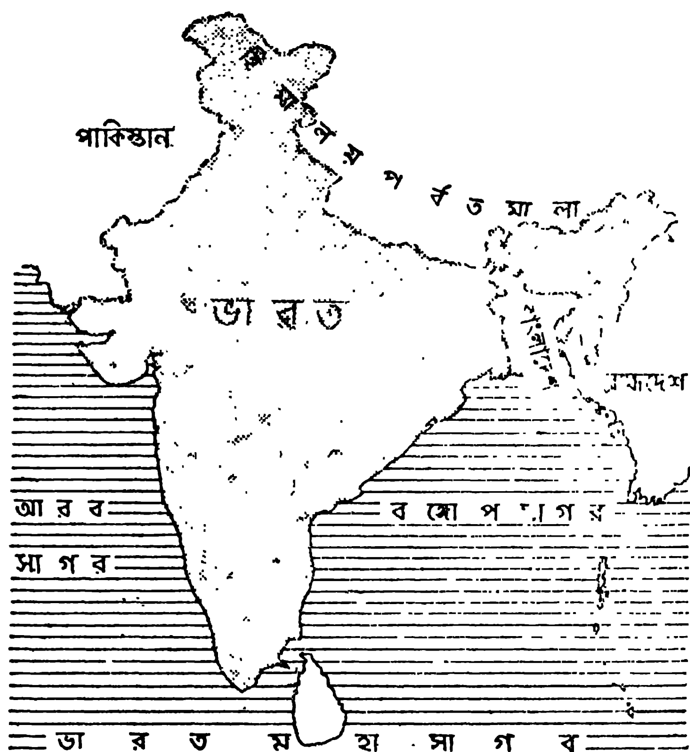
আবার নানা পণ্ডিতের নানা মত। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতটাকেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। অধিকাংশ পণ্ডিতই বলেছেন—সিন্ধু নদ এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। গ্রীক ভাষায় সিন্ধু নদের নাম 'ইণ্ডাস্'। এই ইণ্ডাস্ থেকে 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি।

ইণ্ডিয়া তো ইংরেজী নাম, আমরা বলি—ভারত। এই ভারত নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও মতভেদ আছে। কারোর কারোর মতে পুরাকালে 'ভরত' নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম থেকেই 'ভারত' নাম এসেছে। আবার অন্য মতটি হচ্ছে এই ঃ

বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর তীর থেকে আরম্ভ করে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ পর্যন্ত অঞ্চলকে 'মধ্যদেশ' বলা হতো। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে এইখানেই আর্যদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতন হয়েছিল। এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারত, ত্রিৎসু, পুরু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ভারতদের মহিমা ও কীর্তি স্মরণ করে সেকালের বহু গাথা রচিত ও গীত হয়েছিল। আর সেই ভারত-গাথাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল আমাদের অন্যতম মহাকাব্য 'মহাভারত'। মহাভারতের উল্লিখিত এই 'ভারত'দের নামেই এ দেশের নাম হয়েছে 'ভারত'।

নামের পরই দেশের সীমানার কথা বলা দরকার। ভারতের গোটা উত্তর দিকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বতমালা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বতমালা। ভারতের দক্ষিণে আছে দুটি সাগর। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর। পূর্ব দিকে ব্রহ্মদেশ ও বাংলাদেশ। আর পশ্চিম দিকে আরব সাগর ও পাকিস্তান।

সীমানার পরেই আসে আয়তনের কথা। এতই বিরাট এ দেশ, যে ভাবতেও অবাক লাগে! উত্তর থেকে দক্ষিণে ভারত তিন হাজার দু'শ কিলোমিটার (প্রায়:দু'হাজার মাইল)। আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিন



হাজার কিলোমিটার (প্রায় উনিশ শ মাইল)। সমগ্র দেশটির আয়তন বত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছ'শ বর্গকিলোমিটার (প্রায় বারো লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো সাতানব্বই বর্গমাইল)। আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে ভারত হচ্ছে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। আর এত বড় দেশের মানুষ হলাম আমরা!

যে দেশে আমরা বাস করি তার চেহারাটা কেমন, তাও জানা দরকার। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসলে আমরা দেখব যে এখানকার জমি সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু—কোথাও বা সমতল। জমির এ অবস্থা প্রাকৃতিক কারণেই হয়েছে। অবস্থা ভেদে ভারতের জমিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

১। উত্তরের পাহাড়ে জমি ; ২। সিন্ধু-গঙ্গার সমতল ভূমি ;
৩। দক্ষিণের মালভূমি ; ৪। উপকূলের সমভূমি।

আগেই বলেছি যে ভারতের উত্তর দিকে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বতমালা—হিমালয় পর্বতমালা। সদা জাগ্রত প্রহরীর মত এই পর্বতমালা আমাদের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করছে। শুধু কি তাই ! আরও অনেক উপকার করছে সে।

ভারতের আশপাশের সাগর-মহাসাগর জল সূর্যের তাপ পেয়ে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। ঐ জলীয় বাষ্প বাতাসে মিশে আকাশে উঠে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে মেঘ। ভারতের আকাশে উড়তে উড়তে ঐ মেঘ বাধা পাচ্ছে হিমালয়ের গায়ে। হিমশীতল হিমালয়ের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে মেঘ শীতল হয়ে বৃষ্টি ঢালছে। সেই বৃষ্টির জল পেয়ে 'উত্তরের শুকনো পাহাড়ে জমি' যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে।

আবার হিমালয়ের চূড়াগুলি খুব উঁচু বলে বারো মাসই বরফে ঢাকা থাকে। সূর্যের প্রখর তাপে সেই বরফ অল্প অল্প করে গলে। আর সেই বরফ-গলা জলে ভারতের অনেক নদীই পুষ্ট হয়। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদী ঐ বরফ গলা জল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঐ জলেই এদের পুষ্টি। এই সব নদী ও তাদের শাখানদী

ভারতের মাটিকে রেখেছে সরস করে। এদের পলিমাটি পেয়ে ভারতের জমি হচ্ছে উর্বর।

হিমালয়ের বুকে আছে বিরাট বিশাল বন। এই সব বন ভারতের এক বড় সম্পদ। এখানকার বনে পাইন, ওক, ফার, দেবদারু প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাইসন, কস্তুরী মৃগ, হাতি, বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি অনেক প্রাণীই বাস করে এ বনে। বনের কাঠ, বনের পশু—সবই দেশের সম্পদ। উত্তরের এই পাহাড়ে জমি থেকে আমরা ফসলও নেহাৎ কম পাই না। এ জমিতে বালি, ওট, বাজরা প্রভৃতি শস্য ভালই জন্মে। আর জন্মে চা এবং প্রচুর কমলালেবু।

ভারতের দুই বিখ্যাত নদী—সিন্ধু আর গঙ্গা। এই দুই নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া জমি বেশ সমতল—উর্বর তো বটেই। এই জমির নামই 'সিন্ধু-গঙ্গার সমতলভূমি'। এখানে প্রায় সব রকমের শস্যই জন্মে।

উঁচু সমতল ভূমিকে আমরা বলে থাকি মালভূমি। ভারতের দক্ষিণ দিকটা একটা মালভূমি। নাম 'দক্ষিণের মালভূমি'। শক্ত পাথুরে মাটি এখানকার। তবুও ফসল ফলে। ধান, তুলো, চা, কফি ও আরও অনেক কিছু।

ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের নাম দাক্ষিণাত্য। চোখের সামনে ভারতের মানচিত্র খুলে রাখলে দেখা যাবে যে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব দিকে সমুদ্র। পশ্চিমেও তাই। সমুদ্রের ধার বরাবর জমিটা সমতল। কোথাও চল্লিশ মাইলের বেশী চওড়া নয়। এরই নাম 'উপকূলের সমভূমি'। পলিমাটি দিয়ে গড়া বলে বেশ উর্বর এ জমি। তাই এ জমিতে ফসলও খুব ভাল জন্মে।

আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশ অতি বিরাট। এর বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা আলাদা—আলাদা ধর্ম ও সংস্কৃতি।

এমন দেশকে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখার অসুবিধা অনেক। তাই ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর দ্বারা দেশ শাসনের ক্ষমতা কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

তবে এর মধ্যেও একটা কথা আছে। দেশে হয়তো কখনো কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলো। রাষ্ট্রপতি তখন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। বাতিল করে দিতে পারেন রাজ্য সরকারগুলিকে। তারপর গোটা দেশের শাসন-ভার তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারেন। আর তখন দেশে এক কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতের শাসন-ব্যবস্থার এ এক বৈশিষ্ট্য।

আয়তন ও গুরুত্ব অনুসারে ভারতকে কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে আছে একুশটি রাজ্য আর আটটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ঃ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ঃ

১। আসাম ;	২। মহীশূর ;	৩। মধ্য প্রদেশ ;
৪। উড়িষ্যা ;	৫। হরিয়ানা ;	৬। অন্ধ্র প্রদেশ
৭। কেরালা ;	৮। মণিপুর ;	৯। তামিলনাড়ু ;
১০। ত্রিপুরা ;	১১। মহারাষ্ট্র ;	১২। উত্তর প্রদেশ ;
১৩। পাঞ্জাব ;	১৪। নাগাভূমি ;	১৫। হিমাচল প্রদেশ ;
১৬। বিহার ;	১৭। রাজস্থান ;	১৮। পশ্চিম বাঙলা ;
১৯। গুজরাট ;	২০। মেঘালয় ;	২১। জম্মু ও কাশ্মীর।

ভারতের কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ঃ

১। দিল্লী ;	২। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ;
৩। পণ্ডিচেরী ;	৪। লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ ;
৫। মিজোরাম ;	৬। দাদরা ও নগর হাভেলী ;
৭। অরুণাচল ;	৮। গোয়া, দমন ও দিউ।

২

ভারতের বৈশিষ্ট্য

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।'

এই ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—আমাদের জন্মভূমি। কি সুন্দর আমাদের দেশ! এর তিন দিকে নীল সমুদ্র। উত্তরে তুষার শুভ্র হিমালয়। মাঝখানে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সমতল ভূমি। ভারতের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সুন্দর সুন্দর কতো নদী—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা। ভারতের মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এ দেশকে উদ্দেশ করে বলেছেন: 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'। সত্যিই তাই! আপন সৌন্দর্য দিয়ে ভারত গোটা পৃথিবীর মন ভুলিয়েছে।

এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদও কম নয়। এমন শস্য-শ্যামলা দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এ দেশের মাটি তো নয়—যেন সোনা! হেন ফসল নেই, যা এ দেশের মাটিতে ফলে না। হেন খনিজ নেই, যা ভারতের ভূগর্ভে পাওয়া যায় না। লোহা, সোনা, অভ্র, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, পেট্রোলিয়ম—সবই আছে এদেশে। দেশের গহন বনগুলি থেকে পাওয়া যায় দামী দামী কাঠ আর কত শত জীব-জন্তু। দেশের বড় বড় নদীগুলি একদিকে কৃষির জল সরবরাহ করে, অপরদিকে ওদের জল থেকেই চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

ভারতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন এ দেশের বুক জুড়ে আছে। ভারতের মাটি খুঁড়ে

প্রস্তর যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে তাম্র যুগেরও নিদর্শন। মোগল যুগের স্মৃতি চিহ্ন তো ভারতের সর্বত্রই অল্প বিস্তর ছড়িয়ে আছে; ভারতের রাজধানী দিল্লী বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের স্মৃতিচিহ্নে ভরা। আগ্রার তাজমহল, অজন্তা-ইলোরার শিল্পকলা, কোনারক ও মাদুরার মন্দির—এই সবই ভারতের গৌরবময়-অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। এমন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্নে ভরা দেশ, মন্দির-মসজিদ আর সমাধি-ভবনে ভরা দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি দেশ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত ছিল; ভারত তাহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বিদ্যার্থীরা আসতেন শিক্ষালাভ করতে। নালন্দার ধ্বংস-স্তূপ আজও বৌদ্ধযুগের এক প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। এই নালন্দায় একদা দশ হাজার বিদ্যার্থীর বসবাস ছিল।

ভারতের অতীত ইতিহাস ছিল খুবই গৌরবময়। প্রাচীন ভারতের মানুষ জাহাজ নির্মাণে পটু ছিলেন। নিজেদের তৈরী জাহাজে চড়ে তাঁরা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। অনেকে যেতেন ধর্মপ্রচার করতে। এঁদের অনেকেই সেকালে ইন্দোচীন, যবদ্বীপ ও ভারত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওসব দেশের লোকদের শিখিয়েছিলেন আমাদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও আইন-কানুন।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেকে ছিলেন সুদক্ষ স্থপতি, বিখ্যাত শিল্পী। ভারতের সর্বত্রই তাঁদের স্থাপত্য ও শিল্প প্রতিভার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে এ দেশে স্বনামধন্য কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, বীর ও সাধুপুরুষ জন্মেছেন। তাঁদের কীর্তি

আজও অমর হয়ে আছে। তাঁদের স্মরণ করলে আজও শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।

যে দেশের অতীত ইতিহাস এত গৌরবোজ্জ্বল সেই দেশেরই মানুষ আমরা! তাই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আমরা আশান্বিত হই।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। যেমন বিরাট এর বিস্তার, তেমনি অফুরন্ত এর বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যই ভারতীয় ইতিহাসের পরম বৈশিষ্ট্য। এ বৈচিত্র্য শুধু ভৌগোলিক নয়—সব দিকের। ভারতের মানুষ তাদের গঠন, দেহের রং, কেশের আকৃতি, তাদের খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা, ভাব-ভাষা—সব কিছুর মধ্যেই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যই এ দেশের মহিমাকে আরও বাড়িয়েছে।

ভারতের কোন অংশ সুজলা-সুফলা, আবার কোন অংশ ঊষর মরুভূমি। কোথাও বরফে ঢাকা উঁচু গিরিশৃঙ্গ, আবার কোথাও গভীর গহ্বর। কোথাও প্রবল বারিপাত হয়, আবার কোন অঞ্চল সম্পূর্ণ বৃষ্টিহীন। বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ ও জন্তু-জানোয়ার বিভিন্ন—আবহাওয়াও বিভিন্ন। কোথাও প্রচণ্ড শীত, কোথাও দারুণ গ্রীষ্ম। আবার এমন স্থানও আছে যেখানে শীত-গ্রীষ্ম কোনটারই তেমন প্রকোপ নেই। মনে হয়—সারা বছরই যেন বসন্তকাল।

ভারতে সবচেয়ে বড় বৈচিত্র্য দেখা যায় মানুষের মধ্যে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের লোক বাস করে। কেউ ধবধবে ফর্সা, কেউ মিশমিশে কালো। কেউ দীর্ঘাকৃতি, কেউ খর্বাকার। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ আলাদা। সামাজিক রীতিনীতি ও ভাষাও আলাদা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ প্রভৃতি সব

ধর্মের লোকই বাস করে এদেশে। কেউ যায় মন্দিরে, কেউ মসজিদে, আবার কেউ-বা যায় গীর্জায়। কিন্তু যে যেখানেই যাক না কেন, নাম করে মাত্র একজনের—ঈশ্বরের। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। নাগাদের জীবনযাত্রা প্রণালী এক রকম—বাঙ্গালীদের অন্য রকম।

এত বড় আর এত বৈচিত্র্যে ভরা দেশ বলেই ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে কত পার্থক্য কিন্তু এরই মধ্যে একটি সর্বব্যাপী ঐক্যের বন্ধন রয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ বিরাজ করছে। বাইরে থেকে দেখলে কেউ বাঙ্গালী কেউ পাঞ্জাবী, কেউ-বা বিহারী। কিন্তু আসলে এরা সবাই এক—ভারতীয়, এক ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টির অংশ। এদের অতীত ইতিহাস, এক, দেশ এক, এক এদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এরা সবাই ভারতবাসী—একই ঐতিহ্যের অধিকারী। এরা সবাই একই সুখ-দুঃখের অংশীদার।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জাতি এসে 'ভারত-তীর্থে' মিলিত হয়েছে। গড়ে তুলেছে এক ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি। দূরের মানুষ আমাদের আপন হয়েছে। তারা তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভারতভূমির সন্তান বলে পরিচিত হয়েছে। বহু মানুষকে ভারত এক করে নিয়েছে। তাই তো কবি বলেছেন ঃ

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

বহুর মিলনতীর্থ এই ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—আমাদের জন্ম-ভূমি। আর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুর মধ্যে একত্ব উপলব্ধিই ভারতের বৈশিষ্ট্য।

ভারতের সংবিধান

দেশ শাসন করতে হলে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। সেই সব নীতিগুলি এবং তাদের ব্যাখ্যা যে বইতে লেখা থাকে তারই নাম 'সংবিধান'। কাজেই সংবিধান আর কিছুই নয়—লিখিত শাসনতন্ত্র।

ইংরেজ আমলে ভারতের শাসনব্যবস্থা ইংরেজদের নির্ধারিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু হয়। আর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের প্রথমেই একটি প্রস্তাবনা থাকে। এই প্রস্তাবনাকে সংবিধানের ভূমিকা বলা যেতে পারে। যেমন গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার তাঁর মূল বক্তব্য ও গ্রন্থের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন, প্রস্তাবনাতেও তেমনি সংবিধানের উদ্দেশ্য, মূলনীতি আইনগত ভিত্তির বর্ণনা দেওয়া থাকে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

'আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করছি। ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার-দানের ব্রত গ্রহণ করছি।

'এই রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধর্মমত ও উপাসনার স্বাধীনতা থাকবে। থাকবে মর্যাদা ও সুযোগ

লাভের সমান অধিকার। আর ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে প্রীতির ভাব জাগিয়ে তোলার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা হবে।'

প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—ভারত একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র'। এ কথাগুলির অর্থ একটু পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। 'সার্বভৌম' বলতে বোঝানো হয়েছে যে এ দেশ তার ভেতরকার ও বাইরের যে কোন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলতে বোঝানো হয়েছে যে এ দেশের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের আদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দেশের শাসনক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর 'সাধারণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্রে রাজার স্থান নেই—দেশের শাসন-ক্ষমতা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই ন্যস্ত।

ভারতের নাগরিকদের নিয়েই গড়ে উঠেছে ভারত রাষ্ট্র। কাজেই নাগরিকদের জন্যে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা ভারতের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে ভারত তার প্রত্যেকটি নাগরিককে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগ-সুবিধা-গুলিকে 'অধিকার' বলা হয়। অধিকারগুলির মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে 'মৌলিক অধিকার'। মৌলিক অধিকার সংখ্যায় সাতটি। এই অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত। তার মানে, সংবিধান সংশোধন না করে মৌলিক অধিকারের পরিবর্তন সাধন করা যায় না।

আমাদের সাতটি মৌলিক অধিকার

১। **সাম্যের অধিকার:** আইনের চোখে সব নাগরিকের সমান রক্ষণাবেক্ষণ লাভের অধিকার আছে। রাষ্ট্রের আইন সকলের ক্ষেত্রে

সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। এ ব্যাপারে ধনী-নির্ধন, ধর্ম-সম্প্রদায়, জাতি বা স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য থাকবে না।

২। **স্বাধীনতার অধিকার :** এর দ্বারা ভারতীয় নাগরিকদের কথা বলা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। বিনা অস্ত্রে যে কোন জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার থাকবে। ভারতে সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে। ভারতের মধ্যে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও বসবাসের অধিকার থাকবে। সম্পত্তি কেনা-বেচার ও ভোগ-দখলের অধিকার থাকবে। আর অধিকার থাকবে যে কোন বৃত্তি বা উপজীবিকা অবলম্বনের।

৩। **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :** এর দ্বারা মানুষ নিয়ে ব্যবসা করা চলবে না; মানুষকে বেগার খাটানো বা জোর করে খাটানো চলবে না; চৌদ্দ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের কল-কারখানায় বা খনিতে কাজে লাগানো চলবে না। এ সব নিয়ম লঙ্ঘন করলে আইনানুসারে দণ্ড পেতে হবে।

৪। **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :** এর দ্বারা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে। ধর্ম প্রচারেরও অধিকার থাকবে।

৫। **সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার :** নাগরিকদের সবারই নিজেদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি রক্ষা করার অধিকার আছে। সরকারী ও সরকার হতে সাহায্য পাওয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার সবারই আছে। ধর্ম জাতি, বর্ণ বা ভাষার দরুণ কেউই ঐ সব শিক্ষায়তনে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

৬। **সম্পত্তির অধিকার :** এর দ্বারা আইনের নির্দেশ ছাড়া কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। জনসাধারণের

স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র কারও সম্পত্তি দখল করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

৭। **শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিকারের অধিকার**ঃ এর দ্বারা মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারোর মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তিনি সুপ্রীম কোর্টে বিচার লাভের প্রার্থনা জানাতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট হচ্ছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।

ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ধর্ম-নিরপেক্ষতা। ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। এ রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার আছে।

ভারতীয়-প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র বলতে এক কথায় আমরা বুঝি জনগণের শাসন। কিন্তু এ সংজ্ঞার অর্থ খুবই সংকীর্ণ। বৃহত্তর অর্থে গণতন্ত্র এক বিশেষ ধরনের সমাজ-ব্যবস্থাও বটে। এ ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সবারই সমান অধিকার।

গণতান্ত্রিক দেশ এই ভারতে ভোট দিয়ে জনসাধারণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি যোগ্য হলো তো ভালই কিন্তু অযোগ্য হলেই বিপদ। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক দেশ ভারতকে তাই জনমত সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকতে হয়। কারণ জনমতের উপরই নির্ভর করে গণতন্ত্রের ভিত্তি। আর এই জনমত প্রকাশিত হয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে নির্বাচনের ভিত্তি ছিল শিক্ষা অথবা সম্পত্তি কিংবা কর দেওয়া। এ সবের ভিত্তিতে ভোটাধিকারের ব্যবস্থা

করলে জনসাধরণের মধ্যে বৈষম্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই জন্যে পণ্ডিতদের মতে—গণতান্ত্রিক দেশে সব প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। স্বাধীন ভারত তাই তার জনগণকে সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়েছে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার

সর্বজনীন ভোটাধিকারে কিন্তু সমাজের সবাই ভোট দেবার অধিকার পায় না। পায় কেবল প্রাপ্ত-বয়স্ক নর-নারীরাই। ভারতের নাগরিক একুশ বছর বয়স্ক হলেই প্রাপ্ত-বয়স্ক বলে স্বীকৃত হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তখন তারা ভোট দেবার অধিকার পায়। কিন্তু এর মধ্যেও একটা ব্যতিক্রম আছে। কোন প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিক হয়তো উন্মাদ কিংবা দেউলিয়া অর্থাৎ তার দেনা পরিশোধে সে অক্ষম কিংবা ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত—প্রাপ্ত-বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু ভোট দেবার অধিকারী হবে না। এইটাই নিয়ম।

বর্তমানে ভারতের প্রায় কুড়ি কোটি নাগরিকের ভোট দেবার অধিকার আছে। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এত লোককে ভোটাধিকার দেওয়ার নজির আর নেই।

রাজ্যের বিধানসভায় প্রতি পঁচাত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। আর কেন্দ্রীয় লোকসভায় প্রতি পাঁচ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কাজেই ভারতে ভোটদাতাদের দায়িত্ব খুব বেশী। সৎ ও যোগ্য লোক নির্বাচনের উপর ভারতের মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করছে। আর সেই শুভ-অশুভ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এসে পড়েছে ভারতের কুড়ি কোটি ভোটদাতার উপর।

এক নাগরিকত্ব

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতীয়দের এক নাগরিকত্ব ভিন্ন তাদের অন্য কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নেই। আমি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে পারি, কিন্তু আমার নাগরিকত্ব হচ্ছে ভারতীয়। ভারতের নাগরিক বলে পরিচিত হতে হলে কোন লোককে নীচের শর্তগুলির মধ্যে যে কোন একটি শর্ত পূরণ করতে হবে ঃ

১। সংবিধান প্রবর্তনের সময় যিনি ভারতের অধিবাসী ছিলেন তিনি ভারতের নাগরিক হতে পারেন ; অথবা যদি নিম্নলিখিত যে কোন একটি যোগ্যতা তাঁর থাকে ঃ

(ক) যদি তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন ;

(খ) যদি তাঁর পিতা বা মাতা ভারতে জন্মে থাকেন ;

(গ) সংবিধান প্রবর্তনের আগে যদি তিনি কমপক্ষে পাঁচ বছর ভারতে বসবাস করে থাকেন।

২। হয়তো কোন ব্যক্তির পিতা বা মাতা কিংবা পিতামহ বা পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মেছিলেন, তিনিও ভারতের নাগরিক হতে পারেন—যদি ঃ

(ক) তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে ভারতে এসে থাকেন। শুধু আসাই নয়, এখানে এসে বসবাস করাও চাই।

অথবা, (খ) তিনি ঐ তারিখের পর ভারতে এসে কমপক্ষে ছয়মাস বসবাস করে থাকেন। সেই সঙ্গে ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজের নাম রেজেষ্ট্রী করে থাকেন।

মনে করা যাক, কোন ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) ।

কিন্তু পরে তিনি আবার ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। নিজের নাম ভারতীয় নাগরিক হিসাবে রেজিস্ট্রীও করেছেন। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ভারতেরই নাগরিক হবেন।

অথবা, এক ব্যক্তি ভারতে জন্মেছেন কিংবা তিনি ভারতীয় পিতামাতার সন্তান, কিন্তু, ঐ ব্যক্তি অন্য কোন দেশে বাস করেন—ধরা যাক বাস করেন ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে ভারতের রাষ্ট্র-প্রতিনিধি আছেন। তাঁর কাছে তিনি ভারতের নাগরিক হবার জন্য আবেদন করতে পারেন আর তা করলে তিনি ভারতেরই নাগরিক হবেন।

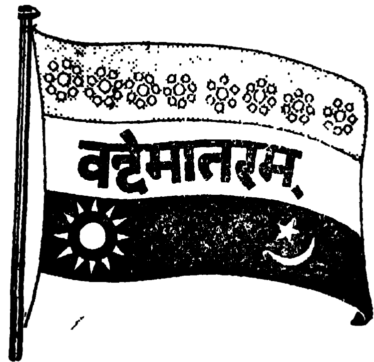
যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন তিনি আর ভারতের নাগরিক থাকতে পারবেন না।

ভারতের জাতীয় পতাকা

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিই আত্মচেতনা লাভ করেছে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে জাতি তার আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠিক করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়—এগুলিকে একটি প্রতীকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছে। আর তারই ফলে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকম জাতীয় পতাকার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করলেন। বাঙ্গালীর সুপ্ত বীর্য তখন জেগে উঠলো। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হলো। সেই আন্দোলনের সময়েই ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করা হলো। ১৯০৬ সালের ৭ই অগস্ট কলকাতার পার্সীবাগান স্কোয়ারে ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলো।

এই পতাকায় সমান্তরাল ভাবে লাল, হলদে ও সবুজ রঙের তিনটি স্তর ছিল। উপরের অংশ ছিল সূচিশিল্প খচিত সারি বাঁধা আটটি শ্বেত পদ্ম। হলদে অংশে গাঢ় নীল রঙে দেবনাগরী হরফে লেখা ছিল 'বন্দেমাতরম্'। নীচের অংশের বাঁ দিকে ছিল সাদা রঙের সূর্য আর ডান দিকে ছিল সাদা রঙের অর্ধচন্দ্র ও তারকা।



ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা

ভারতের দ্বিতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় প্যারিসে—১৯০৭ সালে। পতাকা উত্তোলন করেন মাদাম কামা ও একদল

নির্বাসিত বিপ্লবী কর্মী। প্রথম পতাকার সঙ্গে এই পতাকার বিশেষ কোন তফাত ছিল না। কেবল ওপরের অংশের একটি পদ্ম ও সপ্তর্ষির প্রতীক সাতটি তারকা খচিত ছিল ; ভারতে এ পতাকার প্রচলন হয়নি।

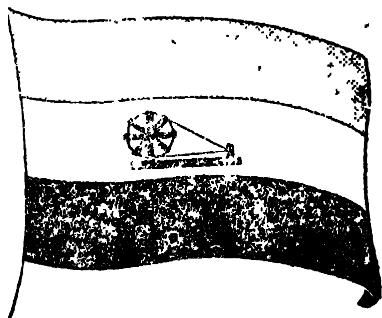
এর পর দীর্ঘ তের বছর কেটে গেল। এলো ১৯২০ সাল। নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব নেওয়া হলো। আন্দোলনের শুরুতেই ভারতে এক অভূতপূর্ব জীবন স্পন্দন দেখা দিল। আর সেই শুভ মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী জাতিকে উপহার দিলেন তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা।

গান্ধীজী পরিকল্পিত এই জাতীয় পতাকা খাদিতে তৈরী। কার্পাসের হোক বা রেশমের হোক—হাতে কাটা সুতোয় তৈরী কাপড়কে খাদি বলা হয়। এই পতাকাতেও ছিল তিনটি রং। নীচে হিন্দুর প্রতীক লাল রং, মাঝখানে মুসলমানের প্রতীক সবুজ রং আর সবার ওপরে সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতীক সাদা রং। জাতির দৃষ্টিতে সবল ও দুর্বল, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু—সবার স্থান সমান। তাই জাতীয় পতাকায় সব রঙের জন্য সমপরিমাণ স্থান নির্দিষ্ট হলো। আর পতাকার মাঝখানে আঁকা হলো চরকা।

ভারতবাসী গান্ধীজী পরিকল্পিত এই পতাকাকে গ্রহণ করলো বটে তবে তার সমালোচনাও বড় কম হলো না। জাতীয় পতাকায় সম্প্রদায় বিশেষের প্রতীক থাকা উচিত নয়—সমালোচকের এই ছিল মত।

এর পর আরও দশ বছর কেটে গেল। ১৯৩১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত হলো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। এই অধিবেশনে জাতীয় পতাকার রূপ সামান্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হলো। স্থির হলো—জাতীয় পতাকা তিনরঙই হবে তবে উপরে থাকবে জাফরান রং, মাঝখানে সাদা ও নীচে সবুজ। রং তিনটি

পতাকায় সমান্তরাল ভাবে সাজানো থাকবে। সাদা অংশের মাঝখানে শোভা পাবে গাঢ় নীল রঙের একটি চরকা। পতাকার রংগুলির কোন সম্প্রদায়গত ব্যাখ্যা থাকবে না। জাফরান রং হবে সাহস ও ত্যাগের প্রতীক; সাদা হবে শান্তি ও সত্যের প্রতীক; সবুজ হবে বিশ্বাস ও শৌর্যের প্রতীক; আর চরকা হবে জনসাধারণের আ শা-আ কা ঙ্ক্ষা র প্রতীক। পতাকার দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের দেড় গুণ।



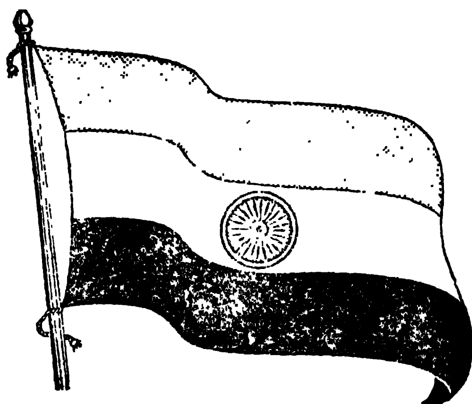
১৯৩১ সালে কংগ্রেস নির্ধারিত জাতীয় পতাকা

কংগ্রেস পরিকল্পিত এই পতাকাই পরে জাতীয় পতাকা-রূপে স্বীকৃতি পায়। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত এর রূপ ও ব্যাখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

এর পর এলো সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্মরণীয় দিন—১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট। ঐ দিন ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হলো। স্বাধীন হলো আমাদের দেশ। তখন ভারতীয় গণপরিষদের সুপারিশে জাতীয় পতাকার সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হলো। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই পতাকার এই পরিবর্তিত রূপ স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকারূপে স্বীকৃত হলো।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকাও খাদিতে তৈরি এবং তিন রঙা। রং তিনটি সমান্তরালভাবে সাজানো। উপরের জাফরান রং সাহস ও ত্যাগের প্রতীক; মধ্যের সাদা রং সত্য ও শান্তির প্রতীক; আর নীচের সবুজ রং বিশ্বাস ও বীরত্বের প্রতীক। পতাকার মাঝখানে

সাদা রঙের উপর শোভা পায় গাঢ় নীল রঙের চক্র। চক্রের মাঝখানে চব্বিশটি দণ্ড চক্রাকারে সাজানো আছে। একে আমরা 'অশোক-চক্র' বলি। কারণ এটি সারনাথের অশোক-স্তম্ভের উপর আঁকা অশোক-চক্রের অনুরূপ। চক্রটির ব্যাস পতাকার সাদা অংশের প্রস্থের প্রায় সমান।



স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা

এই যে চক্র—এ চক্র সম্রাট অশোক কিন্তু উদ্ভাবন করেন নি ; এটি করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'ধম্ম চক্ক'। (অর্থাৎ 'ধর্ম চক্র')। পালি ভাষায় 'ধম্ম চক্ক' বলতে বোঝায় 'ন্যায়ের রাজ্য'। পশুবলের বদলে ন্যায়-নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা। সারনাথের বুদ্ধদেব প্রথম এই ধম্ম চক্কের প্রবর্তন করেন। এর আদর্শের ব্যাখ্যাও দেন সেখানে বসে। তাই সারনাথেই পাথরে খোদাই করে এই চক্রের প্রতিষ্ঠা করেন বুদ্ধভক্ত সম্রাট অশোক। যাই হোক্ এই চক্র ভারতে অতীত সংস্কৃতির প্রতীক। প্রাচীন ভারতেরও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

জাতীয় পতাকা জাতির সমষ্টিগত মর্যাদাবোধের প্রতীক। জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্য জাতির প্রত্যেকটি লোক তার সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত—পত্ পত্ করে উড়ে জাতীয় পতাকা এই কথাই ঘোষণা করে। যে জাতি আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নি, জাতির পতাকা তার কাছে মূল্যহীন।

জাতির পতাকা জাতির মর্যাদাবোধের প্রতীক। তাই এ পতাকাকে লাঞ্ছিত হতে দেওয়া জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা। যুগে যুগে এই জাতীয় পতাকা জাতি ও ব্যক্তিকে কতো প্রেরণা, শক্তি ও উন্মাদনা জুগিয়েছে। এই পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বহু দেশপ্রেমিক নির্মম অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। অনেকে আবার এর সম্মান রক্ষা করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছেন—শহীদ হয়েছেন। কাজেই জাতীয় পতাকা আমাদের কাছে একটি অতি পবিত্র বস্তু।

জাতীয় পতাকা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক জাতিরই একটা নিজস্ব পতাকার প্রয়োজন আছে। লক্ষ লক্ষ লোক আত্মোৎসর্গ করেছে পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্যে। একে একরকম পৌত্তলিকতা বলা চলে ; কিন্তু তাই বলে একে ধ্বংস করাও মহাপাপ। কারণ, পতাকা হলো একটি আদর্শ প্রতীক। ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা তোলা মাত্রই ইংরেজদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তার পরিমাপ করা সহজ নয়। পতাকার তারা ও ডোরা দাগ আমেরিকানদের কাছে যেন একটা স্বতন্ত্র জগৎ। অর্ধচন্দ্র ও তারকা ইসলাম ধর্মীদের চিত্তে অদম্য নির্ভীকতার উন্মেষ করে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, পার্শী প্রত্যেকের এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের এমন একটি স্বাধীন পতাকা গ্রহণ করতে হবে—যা জীবন-মরণে ধ্রুব আদর্শ হয়ে থাকবে।'

স্বাধীন ভারতে আমরা তেমনি একটি পতাকাকে জাতীয় পতাকা

রূপে গ্রহণ করেছি। এমন একটি আদর্শ প্রতীককে খুশীমত ব্যবহার করা চলে না। এটিকে ব্যবহারের কতকগুলি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। আর তা করলেই জাতীয় পতাকার প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হয়। তাই কি ভাবে পতাকা ওঠাতে-নামাতে হয়, কি ভাবে পতাকা অভিবাদন করতে হয়, কি ভাবে পতাকা অর্ধনমিত করতে হয়—এ সব নিয়ম আমাদের সকলের জানা দরকার।

আমাদের জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্পর্কে যে সব বিধি-নিষেধ আছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর জাতীয় পতাকার আচ্ছাদন দেওয়া চলবে না।

২। জাতীয় পতাকার উপরে অথবা ডানদিকে অন্য কোন পতাকা অথবা প্রতীক রাখা চলবে না।

৩। পতাকা কোন সময়েই কাত করে অথবা শায়িত ভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। সব সময়েই তাকে উপরে খাড়া করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা নিয়ে যেতে হলে শোভাযাত্রার পুরোভাগে তা থাকবে। পতাকাবাহী তাঁর ডান কাঁধে উঁচু করে ধরে পতাকা বয়ে নিয়ে যাবেন।

৪। সভা-সমিতিতে পতাকাটি বক্তার পিছনে তাঁর মাথা থেকে উঁচুতে অবস্থিত থাকবে। তা ছাড়া সভাগৃহের অন্যান্য সাজসজ্জার চেয়ে উর্ধ্বে থাকবে জাতীয় পতাকা।

৫। অন্যান্য পতাকার সঙ্গে জাতীয় পতাকা ওড়বার দরকার হয় অনেক সময়। সে ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাকে সর্বপ্রথম তুলতে হবে, আর নামাতে হবে সবার শেষে।

এই চ
ঐতিহ্যের

৬। জানালার গায়ে, বারান্দায় অথবা বাড়ির সামনে দণ্ডের সাহায্যে পতাকা ওড়ানো যেতে পারে; তবে এ সব ক্ষেত্রে পতাকার জাফরানী রঙের অংশটি থাকবে উপরের দিকে।

৭। পতাকাকে কোন সময়ে বিজ্ঞাপন অথবা সাজ-সজ্জার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। বক্তার টেবিলে বিছিয়ে রাখা অথবা ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া চলবে না। শাড়ির পাড়ে, ছাপা কাপড়ে অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে জাতীয় পতাকার নমুনা ব্যবহার করা চলবে না।

৮। কোন মূর্তির আবরণ খোলার অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা দিয়ে সেই মূর্তি ঢেকে রাখা উচিত হবে না।

৯। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রধান প্রধান অফিসে বারো মাসই জাতীয় পতাকা উড়িয়ে রাখা চলবে।

১০। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, যে কোন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী নিজেদের বাসভবনে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে রাখতে পারেন; আর পারেন পার্লামেণ্ট ও বিধান সভার অধ্যক্ষরা, চীফ কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও জেলা শাসকরা।

১১। নিজেদের গাড়ির সামনে জাতীয় পতাকা ওড়াবার অধিকার সবার নেই। আছে—রাজ্যপাল, যে কোন মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী, বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের কর্তা, চীফ কমিশনার এবং পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধান সভার অধ্যক্ষদের।

১২। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জাতীয় অনুষ্ঠানের দিনে ভারতের সাধারণ মানুষ জাতীয় পতাকা তুলতে পারেন। সেই

দিনগুলি হচ্ছে ঃ স্বাধীনতা দিবস, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্রদিবস ও তৎপরবর্তী জাতীয় সপ্তাহের যে কোন দিবস প্রভৃতি। অবশ্য এক্ষেত্রে জনসাধারণকে পতাকা তোলা ও নামানোর নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে।

পতাকা তোলা একটি অতি পবিত্র অনুষ্ঠান। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে জাতীয় পতাকা প্রত্যেক দিনই তোলা হয়। সেখানে পতাকা ওঠানো-নামানো একটি দৈনিক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। কিন্তু বেসরকারী নাগরিকদের ক্ষেত্রে তা নয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে, জাতীয় উৎসবের দিনেই তাঁরা পতাকা তুলতে পারেন।

পতাকা-তোলার অনুষ্ঠান কোন খোলা জায়গায় অনুষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ জন্যে খোলা জায়গায় একটি বেদী নির্মাণ করতে হয়। সেই বেদীর নাম 'পতাকা বেদী'। বেদীর মাঝখানে পোঁতা হয় পতাকা দণ্ড। দণ্ডটি সোজাভাবে স্থাপন করা হয়।

পতাকা তোলার জন্যে সাধারণত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সমবেত সকলে পতাকার চারপাশে নত মস্তকে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে থাকেন। জাতীয় সংগীত গাওয়া অথবা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে পতাকার দড়ি আকর্ষণ করে পতাকা তোলা হয়। সমবেত সকলকে তখন পতাকা অভিবাদন করতে হয়। পতাকা তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়—যেন জাফরান রং উপরে থাকে, নীচে থাকে সবুজ রং। পতাকার সঙ্গে ফুল বেঁধে দেওয়াটা একটা সুশোভন রীতি। পতাকা উপরে উঠে গেলে বাতাসে ফুলগুলি নীচে ঝরে পড়তে থাকে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা ওড়াবার নিয়ম। পতাকা তুলতে হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর নামাতে হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। পতাকা নামাবার সময়ও

তোলার অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে হয়। নামাবার পর পতাকাটিকে ভাঁজ করে রাখতে হয়। ভাঁজ করারও একটি রীতি আছে। প্রথমে লম্বালম্বি ভাবে প্রত্যেকটি রং-কে দু'ভাঁজে ভাঁজ করতে হয়। পরে জাফরান রংটি যাতে ওপরে ও সবুজ রংটি নীচে থাকে এমন ভাবে ভাঁজ করতে হয়।

দেশের নেতৃস্থানীয় অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে জাতীয় শোক-দিবস পালন করা হয়। জাতীয় শোকের দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হয়। পতাকা অর্ধনমিত করতে হলে প্রথমে তাকে দণ্ডের মাথায় নিয়ে যেতে হয়। তারপর সেখান থেকে দণ্ডের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নামিয়ে আনতে হয় এবং সেইখানেই উড়িয়ে রাখতে হয়। বিশেষ স্মৃতি পালনের দিনে পতাকাকে সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দণ্ডের মাঝখানে এবং দ্বিপ্রহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দণ্ডের আগায় উড়িয়ে রাখতে হয়।



ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

প্রাচীনকালে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে একটি নগর ছিল। সেখানে শাক্যবংশের ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই শাক্যবংশে জন্ম হয় সিদ্ধার্থ গৌতমের। জন্ম সাল ৫৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

রাজপুত্র হলেও শৈশবকাল থেকেই গৌতম ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আর ছিলেন সংসারের প্রতি উদাসীন। পরের দুঃখ দেখলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন।

রাজপুত্র গৌতমের বিয়ে হলো মাত্র ষোলো বছর বয়সে। স্ত্রী যশোধারা সুন্দরী ও অনেক গুণসম্পন্না। বিয়ের পর কিছুকাল রাজকুমার গৌতমের জীবন কাটলো প্রাসাদের ভোগ-ঐশ্বর্যের মাঝে।

রাজকুমার প্রতিদিন প্রাসাদের বাইরে ভ্রমণে বেরুতেন। একদিন ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি দেখলেন এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে। আর একদিন দেখলেন ব্যাধিতে জর্জরিত একটি লোককে। তৃতীয় দিন দেখলেন একটি শবদেহ। আর চতুর্থ দিন দেখলেন এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীকে।

এই চারিদিনের চারিটি দৃশ্য রাজকুমারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। রোগ-দুঃখ-জরা-মরণের চিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। চিন্তা করতে করতে সংসারের ভোগসুখে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মালো। দিনরাত তাঁর এক চিন্তা—রোগ-দুঃখ-জরা-মরণের হাত

থেকে কি মানুষের নিষ্কৃতি নেই ? মুক্তি তবে কিসে ? শান্তি কিসে ? চিন্তা করতে করতে গৌতম প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। এমন সময় তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল।

সংসারের অনিত্যতায় গৌতম তখন উদ্‌ভ্রান্ত। আবার এদিকে পুত্র-বাৎসল্য তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মন স্থির করে ফেলেন গৌতম—সংসার ত্যাগ করবেনই। করলেনও তাই। এক গভীর রাতে তিনি সুখের নীড় রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গেলেন। ছেড়ে গেলেন স্ত্রী-পুত্র-সন্তান-সংসারের মায়া।

গৃহত্যাগের পর গৌতমের ইচ্ছা হলো—দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে হবে। দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গেলেন রাজগৃহে—এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কাছে। কিন্তু নিরাশ হলেন।



ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব

এরপর গৌতম গয়ায় গিয়ে সন্ন্যাসী হলেন। ছ'বছর কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করলেন। তাতেও ফল হলো না। পেলেন না তিনি খুঁজে মুক্তির পথ। তারপর কাশী। সেখানেও ধ্যানে তিনি মুক্তিতত্ত্বকে খুঁজে পেলেন না। শেষে গৌতম এলেন বুদ্ধগয়ায়। সেখানে বোধি-বৃক্ষের তলায় ধ্যানে বসলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একদিন সহসা মুক্তি-তত্ত্ব তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো। তখন থেকেই 'বুদ্ধ' বা 'জ্ঞানী' নামে তিনি পরিচিত হলেন।

এই বুদ্ধদেবই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। আর অহিংসা, শান্তি সাম্য ও মৈত্রীই বৌদ্ধধর্মের সারকথা। অসংযত সুখভোগ অথবা সংযত কঠোর তপস্যা—কোনটাই বুদ্ধদেব ভাল বলতেন না। ভোগ বা তপস্যা —কোন পথেই বাড়াবাড়িটা ঠিক নয়। এই ছিল তাঁর মত। এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথই ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। নির্বাণ বা মুক্তি লাভের পথ। বুদ্ধদেব ভাবলেন—এ পথ দেখাতে হবে সাধারণ মানুষকে।

তাই বুদ্ধদেব প্রথমে এলেন কাশীর কাছে সারনাথে। সেখানে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। জনসাধারণকে বোঝালেন যে—কর্মফলের জন্যই মানুষ জীবনে সুখ-দুঃখ লাভ করে। এই কর্মফলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই দরকার নির্বাণ লাভের। আর আটটি সৎ কাজ করলে এই নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। সেই আটটি সৎ কাজ 'অষ্টমার্গ'। —অষ্টমার্গ হচ্ছে ঃ

১। সম্যক্ দৃষ্টি
২। সৎ বাক্য
৩। সৎ সঙ্কল্প
৪। সৎ কর্ম
৫। সৎ জীবন
৬। সৎ চেষ্টা
৭। সৎ স্মৃতি
৮। সম্যক্ সমাধি

সারনাথের যে স্থানে বসে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের এই অষ্টমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন সেই স্থানটিকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করে রেখে গেছেন সম্রাট অশোক। অশোক ছিলেন মগধের রাজা। খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

সম্রাট অশোক উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু তিনি বড়ই পররাজ্য লোভী ছিলেন। কলিঙ্গ রাজ্য তখনও স্বাধীন ছিল। রাজা হওয়ার আট বছর পরই অশোক বহু সৈন্য নিয়ে কলিঙ্গ আক্রমণ করলেন। কলিঙ্গবাসীরা

ভীষণ বাধা দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। রক্তস্রোতে কলিঙ্গ ভেসে গেল। সম্রাট অশোক জিতলেন। কলিঙ্গ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো।

এই যুদ্ধে মারা গেল প্রায় এক লক্ষ লোক। দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত হলো। আর বহু লক্ষ লোক যুদ্ধ জনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা গেল। যুদ্ধের এই সর্বনাশা রূপ দেখে সম্রাট অশোকের অনুশোচনা হলো। শোকে দুঃখে মন তাঁর ভরে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—আর কখনও যুদ্ধ করবেন না।

কলিঙ্গ জয়ের অল্পকাল পরেই অশোক উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। শিকার করা, জলসায় যোগ দেওয়া ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে দেন। ছেড়ে দেন মাছ-মাংস খাওয়া। আরম্ভ করেন তীর্থ দর্শন। আর সেই সঙ্গে করেন প্রভু বুদ্ধের অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচার।



বুদ্ধ-ভক্ত অশোক

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের বহু স্থানে শিলাস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। স্তম্ভগুলির গায়ে ধর্মের বাণী খোদাই করে দিয়েছিলেন। এই স্তম্ভগুলি 'অশোক-স্তম্ভ' নামে পরিচিত। সারানাথে এমনি একটি অশোক-স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যে স্থানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের অষ্টমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন।

সেই স্থানেই অশোক ঐ স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য—প্রভু বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের প্রথম দিনের স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখা। কাজেই সারনাথের অশোক-স্তম্ভটির একদিকে যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তেমনি আছে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অশোক-স্তম্ভের আর একটি গুরুত্ব আছে। কারণ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক গৃহীত হয় সারনাথের ঐ অশোক-স্তম্ভ থেকেই। গ্রহণের তারিখ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী।

স্তম্ভটি বর্তমানে সারনাথ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এটি একটি গোটা পাথরের তৈরী স্তম্ভ। এই স্তম্ভের শীর্ষে চারিটি সিংহমূর্তি পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভ শীর্ষে ও কার্নিসের মাঝখানে একটি হাতি, একটি ধাবমান অশ্ব, একটি বৃষ ও একটী সিংহমূর্তি খোদিত আছে। এর প্রতি দুটি মূর্তির মাঝখানে আছে একটি করে চক্র। এই চক্র ধর্মচক্র নামে অভিহিত হয়। তবে আমরা একে 'অশোক চক্র' বলে থাকি।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক উপরোক্ত অশোক-স্তম্ভের অংশ বিশেষ। এতে চারিটি সিংহ মূর্তি দেখা যায় না—দেখা যায় তিনটি সিংহ মূর্তি। আর দেখা যায় একটি চক্র, ধাবমান অশ্ব ও বৃষটিকে। রাষ্ট্রীয় প্রতীকের নীচে দেবনাগরী হরফে লেখা থাকে 'সত্যমেব জয়তে'।


सत्यमेव जयते

'সত্যমেব জয়তে' মুণ্ডকোপনিষদের একটি বাণী। আমাদের দেশ সত্যের আদর্শে বিশ্বাসী। তাই রাষ্ট্রীয় প্রতীকে আমরা উপনিষদের ঐ বাণীটি রেখেছি। সরকারী চিঠিপত্রে বা দলিলে এই রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতের জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয় সংগীত

প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই একটি করে জাতীয় স্তোত্র আছে। আমাদেরও আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জনগণমন' স্তোত্রটি আমাদের জাতীয় স্তোত্র। স্তোত্রটির পাঁচটি স্তবক। কিন্তু সুর আরোপ করে মাত্র প্রথম স্তবকটিই গাওয়া হয়। সেই প্রথম স্তবকটি হচ্ছে ঃ

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে ॥

এই স্তোত্রটি প্রথম গীত হয় ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে—কলকাতায়, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে।

১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী ভারতীয় গণপরিষদ এই স্তোত্রটিকেই ভারতের জাতীয় স্তোত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভারত সরকার এই স্তোত্রটির একটি সুর অনুমোদন করেছেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে একমাত্র সেই সুরই ব্যবহার করার নির্দেশ আছে।

এই স্তোত্রে কবিগুরু সারা ভারতের ভাগ্য-দেবতার বন্দনা গান করেছেন। বলেছেন—'হে ভারতের মনের রাজা, তোমার জয় হোক। তোমার পবিত্র নামে জেগে উঠে সারা ভারত তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তোমার জয়গান করে, তুমি সব সময় ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করছ।

'ভারতে নানা ধর্ম ও নানা জাতির লোক বাস করে। তারা তোমার ডাকে তোমার সিংহাসনের মাঝে এসে মিলেছে। তুমি সকলের মধ্যে একতাসাধন করেছ। তুমি তোমার রথে করে আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখময় পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। সকল দুঃখ-বিষাদ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করছ। সারা ভারত যখন দুঃখ-দৈন্য-অজ্ঞতা ইত্যাদির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে একান্ত কাতর হয়ে পড়েছে, তখন তুমি মায়ের মত যত্নে তাকে রক্ষা করেছ। তার সকল বিষাদ দূর করেছ।

'তোমার করুণায় আজ ভারতবাসীর দুঃখের রাত্রি কেটেছে। আজ ভারতের সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার প্রভাব দেখা দিয়েছে। এই শুভদিনে ভারত নিদ্রা থেকে উঠে তোমার চরণে প্রণাম জানাচ্ছে। তোমার জয় বন্দনা গাইছে।

এই 'জাতীয় স্তোত্র' জাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। ঐকতানেও বাজানো হয়। তবে ভারত সরকার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রটিকেও 'জনগণমন'-এর

সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তবে 'জনগণমন'কে বলা হয়েছে 'জাতীয় স্তোত্র' এবং 'বন্দে মাতরম'কে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় সংগীত'।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি বাংলা ভাষায় রচিত। এটি প্রকাশিত হয় বহুকাল আগে—১৮৮২ সালে। এই উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রটি আছে। এই স্তোত্রটির প্রথম স্তবক হচ্ছে :

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

এই স্তোত্রেও কবি দেশমাতার জয়গান করেছেন। বলেছেন—'আমাদের এই জন্মভূমি ফল-ফুল-শস্যে ভরা। মৃদু মন্দ দক্ষিণা বাতাসে এই দেশটি শীতল হয়ে থাকে। এ দেশের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। রাত্রিবেলায় চারিদিকে চাঁদের মধুর আলো ছড়িয়ে পড়ে। গাছে গাছে ফুটে থাকে কতো ফুল। মনে হয় গোটা দেশটি যেন হাসছে।

'এ দেশের ভাষা মধুর। এখানকার মানুষ সুখে দিন কাটায়। কোটি কোটি সন্তানের কল-কোলাহলে এ দেশের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে থাকে। তাদের মিলিত শক্তিতে দেশের শক্তি। দেশ জননী তাঁর সন্তানদের সকল বিষাদ থেকে রক্ষা করতে ও শত্রু দমনে সমর্থ—আমরা এই দেশ জননীকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।'

এই হলো ভারতের জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয় সংগীতের কথা। জাতীয় পতাকা যেমন জাতির কাছে অতি পবিত্র বস্তু—এ দুটিও তাই। কারণ এ দুই সংগীতে দেশ মাতৃকার বন্দনা গান গাওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের উচিত জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয় সংগীতকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া।

উভয় স্তোত্রই জাতীয় অনুষ্ঠানে, জাতীয় দিবসে গাওয়া চলতে পারে। যখন তখন বা যে কোন দিন গাইলে এদের মর্যাদা নষ্ট হয়। আর যখন জাতীয় স্তোত্র বা সংগীত গীত হয় তখন সবারই উচিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়ানো। সহজভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। সে সময় হাত দু'খানি দেহের দু'পাশে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে ঝোলানো। যতক্ষণ গান বা তার ঐকতান শেষ না হয় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নীরবে। ভক্তিভরে চোখ বোজা সঙ্গত নয়। সামনে গায়ককে দেখা গেলে তাঁর পানে চেয়ে থাকাই শ্রেয়। নচেৎ সম্মুখ পানে চেয়ে থাকতে হবে। গান শেষ হলে ধীরে ধীরে নিজের আসনে বসতে হবে।

মনে রাখতে হবে—জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয় সংগীত উভয়ই আমাদের কাছে অতি পবিত্র। কাজেই এদের যথোচিত মর্যাদা দেওয়া উচিত। জানানো উচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। মনে রাখা উচিত —এদের অবমাননা হলে দেশের অবমাননা হয়, জাতির অবমাননা হয়। স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাছে তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি আছে!

ভারতের জাতীয় আন্দোলন

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?

কবির কথাই সত্যি। পরাধীনতার গ্লানি কোন জাতির পক্ষেই বেশীদিন সহ্য করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় দাসত্বের শৃঙ্খল পরে দিন কাটানো।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হলো। পলাশীর আমবাগানে সেদিন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা গেলেন হেরে। জয় হলো বিদেশী ইংরেজদের। তারপর বুদ্ধিমান ইংরেজ জাতি ধীরে ধীরে ছলে বলে কৌশলে বাংলার শাসন ভার হস্তগত করল। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে তারা সমগ্র ভারত জয় করে ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসল।

বিদেশী ইংরেজের এই আধিপত্য ভারতবাসী সহ্য করতে পারলো না। সহ্য করতে পারলো না ইংরেজ রাজের যত অবিচার ও অত্যাচার। এ সবের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জাতীয় অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগলো। আরও পরে শুরু হলো ব্যাপক বিদ্রোহ ও গণ আন্দোলন। এ সবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেলো জাতীয় চেতনা ও জাগরণের। শুরু হলো ভারতের জাতীয় আন্দোলন। তারপর সে আন্দোলন বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন চেতনা স্তরের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে পৌঁছুলো।

ইংরেজ শাসকদের শাসন ব্যবস্থা ভারতবাসীদের মনঃপূত হয় নি। ভারতবাসী সহ্য করতে পারে নি ইংরেজের নির্যাতন ও অপমান। মনের মধ্যে তাদের বহুদিনের বহু অসন্তোষ জমা হয়েছিল। জাতীয় জাগরণের প্রথম পর্বে এই সব অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড গণবিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। আমাদের বাংলা দেশও বাদ পড়ে নি তা থেকে। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় খণ্ড বিদ্রোহ বেশ বিস্তারলাভ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক অতি সহজেই সে সব বিদ্রোহ দমন করেছিল।

জাতীয় জাগরণের পরবর্তী পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহ'। সিপাহী বিদ্রোহকে বলা হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সিপাহী বিদ্রোহ হঠাৎ একদিনে কোন কারণে হয়নি—হয়েছে বহুদিনের বহু অভিযোগ ও অসন্তোষের ফলে।

পলাশীর যুদ্ধের পর একশো বছরের ইংরেজ শাসনে ভারতবাসীরা মোটেই খুশী হতে পারেন নি। সেকালে এদেশে অনেকগুলি খণ্ড রাজ্য ছিল। সেই সব রাজ্যের অপুত্রক রাজারা দত্তক পুত্র নিতেন। রাজার মৃত্যুর পর দত্তক পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতেন। এটা এ দেশের প্রাচীন প্রথা। ইংরেজ শাসনকর্তা লর্ড ডালহাউসী এ প্রথা তুলে দিলেন। বল্লেন—দত্তকপুত্র নেওয়া চলবে না। নিলেও তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না। সর্বোপরি সম্পত্তির উপর তাঁর সমস্ত স্বত্ব লোপ পাবে। ইংরেজদের এই নীতির ফলে ভারতের প্রায় সব রাজাই ক্ষুব্ধ হলেন।

তখনকার সেনাদলে এদেশের বহু বীর ও রণদক্ষ সিপাহী ছিল। কিন্তু ইংরেজ সেনারা সিপাহীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতো না—

অবজ্ঞা করতো। তাতে সিপাহীদের মনেও অসন্তোষের দানা বেঁধে ওঠে।

তাছাড়া এখানকার সাধারণ লোক এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার পছন্দ করেনি। পছন্দ করেনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ধর্মপ্রচার। এই সব কারণে ভারতের সাধারণ মানুষও বেশ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

আগুনে ঘি পড়লে আগুন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। এ সময়ের একটি ঘটনা সিপাহীদের মনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে অমনি দপ্ করে জ্বালিয়ে দিল। ইংরেজরা ঐ সময় এক বিশেষ ধরনের রাইফেল সৈন্য-দলে চালু করলো। ঐ রাইফেলের টোটা দাঁতে কেটে ভরতে হতো। রটে গেল যে, ঐ টোটায় নাকি গরু ও শুয়োরের চর্বি আছে। গরু হিন্দুদের নিষিদ্ধ আর শুয়োর নিষিদ্ধ মুসলমানদের। কাজেই ঐ টোটা ব্যবহার করতে সিপাহীরা রাজি হলো না। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। সূচনা হলো সিপাহী বিদ্রোহের।

সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলো ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—বহরমপুরে। সেখান থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো গোটা ভারতে। প্রায় বছর খানেক ধরে এ বিদ্রোহ চললো। কিন্তু ইংরেজরা কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলো। এই বিদ্রোহের সময়েই ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রাণ হারালেন। বিঠুরের নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি হলো। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বর্মায় নির্বাসিত হলেন।

ব্যর্থ হলো সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু হাজার হাজার শহীদের আত্মবলিদান ব্যর্থ হলো না। তা ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুললো।

এরপর ১৮৫৯-৬০ সালে শুরু হলো 'নীল আন্দোলন'। সেকালে এদেশে নীল চাষ হতো। নীল চাষ করবার জন্যে নীলকর সাহেব ও কুঠিয়ালরা কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। তারই বিরুদ্ধে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ—'নীল বিদ্রোহ'। এঁদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাদ্রী লং সাহেবের কারাদণ্ড হলো আর কালীপ্রসন্ন সিংহের হলো জরিমানা। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। মামলা শুরু হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। সারা দেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করলো। তখন লোকের মুখে মুখে শোনা গেল :

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার,
অসময়ে হরিশ মলো, লঙের হলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার !

সুচতুর ইংরেজ শাসক নীল আন্দোলনও দমন করলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা হলো না। ভারতে জাতীয়তা আন্দোলনের স্রোত আরও প্রবল বেগে বইতে লাগলো।

এই সময় দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে দীক্ষা দিতে লাগলেন রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। তারপর এলেন মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন। দেশের সংবাদপত্রগুলিও তখন দেশে আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলো। দেশের কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিকেরা জাতির মানসপটে দেশমাতার চিন্ময়ী রূপটি তুলে ধরলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম,

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই মিলে একজোটে দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন: 'ওঠ, জাগো, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ।' দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ আহ্বান ধ্বনিত হতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র জাতির প্রাণে দেশপ্রেমের নতুন উন্মাদনা জাগালো।

এমন সময় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলো। দিন দিন কংগ্রেসের শক্তি বাড়তে লাগল। কিন্তু আদর্শ ও নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেওয়ায় কংগ্রেসে দুই দল সৃষ্টি হলো—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। দক্ষিণপন্থীরা রক্ষণশীল। তাঁরা ধীরে সুস্থে সবদিক সামলিয়ে, বেশী দায়িত্ব না নিয়ে ইংরেজদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চাইলেন। অপর পক্ষে বামপন্থীরা চাইলেন আন্দোলনরে মধ্য দিয়ে স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে। কংগ্রেসের এই বামপন্থী নেতাদের মধ্যে লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ (ঘোষ) ও অশ্বিনীকুমার দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

কয়েক বছর বাদেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে বিভক্ত করে দিলেন। ভারতবাসীরা বিরোধিতা সত্ত্বেও এ কাজ করলেন। ফলে দেশের মরা মানুষও যেন বেঁচে উঠলো। বিভক্ত বাংলাকে এক করবার জন্য তারা আন্দোলনে মেতে উঠলো। জাতি স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিলো। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার শপথ নিলো। ইংরেজ শাসকরা তাতেও টললো না। তখন দেখা দিল বিপ্লববাদ। ভারতে গড়ে উঠলো বিপ্লবী দল।

মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ভুলবশত দু'জন ইংরেজ মহিলার প্রাণনাশে ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর

সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। কলকাতার মানিকতলা-বাগানে বিপ্লবীরা বোমা, বন্দুক, কার্তুজ ইত্যাদি তৈরির কারখানা গড়েছিলেন। তাঁদের দলের প্রায় সবাই ধরা পড়লেন। বিচার হলো। বিচারে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন কিন্তু বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও আরও দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলো।



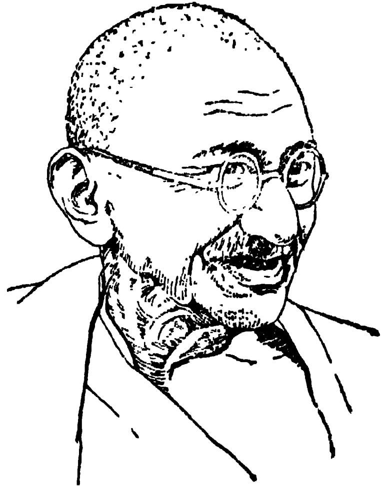
শহীদ ক্ষুদিরাম

এমনি ভাবে যখন গুলি-গোলা চলতে লাগলো তখন ইংরেজদের হুঁস হলো। তারা বুঝলো ভারতবাসীদের এ অসন্তোষ আর জিইয়ে রাখা ঠিক হবে না। ইংরেজ-শাসক তখন বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করলো। সেটা ১৯১১ সাল।

এরপর জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অহিংস আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন ১৯১৫ সালে। এসে দেখলেন বাংলায় তখন জোর বিপ্লব চলছে। বাংলার বিপ্লবীদল রুখে দাঁড়িয়েছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বাংলার লাট এনড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছেন বিপ্লবীদল। বালেশ্বরে বাংলার বীর সন্তান বাঘা যতীন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সহযোগীদের সাথে প্রাণ দিয়েছেন।

গান্ধীজী আরও দেখলেন যে ভারত বৃটিশ শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত। হাজার হাজার মানুষ জেলে আটক। ভারতবাসীর স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নেই। নেই ব্যক্তি স্বাধীনতা। তিনি তখন কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতার সংগ্রামে।

১৯১৯ সালে ইংরেজরা 'রাউলাট আইন' পাশ করলো সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আবার অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। এই আইনের আওতায় জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হলো। আর তারই প্রতিবাদে ভারতে আন্দোলন শুরু হলো। গান্ধীজী অহিংস উপায়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করছিলেন। তাঁকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হলো। তখন জনতা আর অহিংস থাকলো না—হিংসার আশ্রয় নিলো। গোলযোগ এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।



মহাত্মা গান্ধী

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনসাধারণ বৈশাখী মেলা দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালালো ইংরেজ সৈন্য। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো বহু ভারতীয়কে।

গান্ধীজী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন পথ দেখালেন। সে পথ হচ্ছে অহিংস সত্যাগ্রহ। ১৯২০ সালে গান্ধীজী আরম্ভ করলেন

'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'আইন অমান্য আন্দোলন'। সর্বক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে শাসনযন্ত্র অচল করে দেওয়াই তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। কোটি কোটি ভারতবাসী গান্ধীজীর অনুগামী হলেন। তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীর মন্ত্র-শিষ্য জহরলাল নেহেরুও অন্যতম। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি ক্ষেত্রে জহরলাল গান্ধীজীকে অনুসরণ করলেন। বহুবার কারাবরণ করলেন। বহু অত্যাচার সহ্য করলেন কিন্তু অহিংস আন্দোলনের পথ ছাড়লেন না। ছায়ার মত অনুগামী হলেন



জহরলাল

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। দেশবাসীর মতামত না জেনেই তখনকার বড়লাট ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেললেন। দেশে তখন আবার প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। ভারত যুদ্ধে সহযোগিতা করবে না —'না পাই, না ভাই'—এই রায় দিলো দেশব্যাপী। আবার শুরু হলো গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

১৯৪২ সালের এই গণ-আন্দোলন ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল। নাম তার 'অগস্ট আন্দোলন'। ঐ সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আত্মগোপন করে আফগানিস্তান ও রাশিয়ার পথে জার্মানীতে চলে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন জাপানে। অতঃপর তিনি

'আজাদ্ হিন্দ ফৌজ'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বর্মার ভিতর দিয়ে সেই ফৌজ নিয়ে তিনি ভারত সীমান্তে উপস্থিত হলেন। 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে ভারত সীমান্ত মুখরিত হলো।



সুভাষচন্দ্র

ইংরেজ শাসকরা তখন প্রমাদ গণলেন। লণ্ডন থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ছুটে এলেন ভারতে দৌত্যগিরি করতে। মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলী জিন্না তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবী করলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কংগ্রেস ভারত বিভাগে রাজী হলো। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট সোনার ভারত ভেঙ্গে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া হলো—ভারত আর পাকিস্তান। আর সেই সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

ভারতের পোষাক-পরিচ্ছদ

আদিম যুগে মানুষ ছিল অসভ্য। দেহকে সে নগ্ন অবস্থাতেই রাখতো। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে সভ্য হয়েছে। সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। পোষাকের প্রথম প্রয়োজন হয়েছে দেহকে শীত ও তাপ থেকে রক্ষা করার জন্যে। ধীরে ধীরে সেই প্রয়োজনের সঙ্গে অনেক সামাজিক প্রভাব মিশেছে। ফলে পোষাক-পরিচ্ছদের ধরনের তারতম্য ঘটেছে। পরে পোষাকের সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞান ও রুচি মিশেছে। আর তার ফলে পোষাকের বিবর্তন ঘটেছে।

আজ মানুষ পোষাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে শীত ও তাপ থেকে দেহকে রক্ষা করে। লজ্জা নিবারণের ইচ্ছায় নগ্নতাকে ঢেকে রাখে। আর তার মধ্য দিয়ে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। কাজেই আমরা বলতে পারি যে পোষাক-পরিচ্ছদের বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়।

সব বিষয়ে বৈচিত্র্য—ভারতের এক বৈশিষ্ট্য। ভারতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এ দেশে স্ত্রী ও পুরুষের পোষাকের বিভিন্নতা তো আছেই, উপরন্তু এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য আছে। এক কথায় বলা যায়—অঞ্চলভেদে ভারতীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এবার এই বৈচিত্র্যময় ভারতীয় পোষাকের কয়েকটি উদাহরণ দিই।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে পাঞ্জাব রাজ্য। এখানকার অধিবাসীদের পাঞ্জাবী বলা হয়। পাঞ্জাবী পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গি অথবা পায়জামা পরেন। গায়ে দেন লম্বা সার্ট অথবা পাঞ্জাবী। এঁরা মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। পাঞ্জাবী মহিলারা রঙিন শালোয়ার (ঢিলে পায়জামা) পরেন। আর পরেন লম্বা ঝুলের কামিজ ও ওড়না।



পাঞ্জাবী

পাঞ্জাবের উত্তরাংশে কাশ্মীর রাজ্য। কাশ্মীরী পুরুষেরা পায়জামা, লম্বা ঝুলের-পাঞ্জাবী ও শাল পরেন। মাথায় পাগড়ি বাঁধেন অথবা টুপি পরেন। কাশ্মীরী মহিলারা রঙিন শালোয়ার, রঙিন কামিজ ও ওড়না পরেন।

উত্তর প্রদেশ ভারতের একটি বড় রাজ্য। এখানকার পুরুষেরা ধুতি, কামিজ, ফতুয়া, চাদর প্রভৃতি ব্যবহার করেন। উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাথায় পাগড়ি বাঁধেন। আজকাল অনেকে আবার পাগড়ির বদলে খদ্দরের গান্ধী-টুপি ব্যবহার করেন। উত্তর প্রদেশের মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি পরেন। রাজ্যের কোন কোন অংশে নিম্নবর্ণের মহিলারা শাড়ি ও ঘাগরা—দুই-ই ব্যবহার করে থাকেন।



কাশ্মীরী

বাঙালীদের বাস পশ্চিম বাংলায়। এ রাজ্যের পুরুষেরা ধুতি পরেন কাছা দিয়ে। গায়ে দেন সাধারণত পাঞ্জাবী। মহিলারা রঙ-বেরঙের শাড়ি পরেন সর্বাঙ্গ জড়িয়ে। সেই সঙ্গে অন্তর্বাস হিসাবে ব্যবহার করেন সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি। বিবাহিতা

মহিলারা শাড়ি পরেন ঘোমটা দিয়ে। বিধবারাও ঘোমটা দেন কিন্তু কুমারীরা নয়।



বাঙ্গালী মহিলা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজস্থান। এখানকার অধিবাসীদের রাজপুত বলা হয়। রাজপুত পুরুষেরা চুরিদার পায়জামা বা ধুতি ও শেরোয়ানী ধরনের কোর্তা পরেন। তাঁরা মাথায় রঙিন পাগড়ি বাঁধেন। রাজপুত মহিলাদের পরনে থাকে রঙিন ঘাগরা বা শাড়ি, তার সাথে কামিজ ও ওড়না।



রাজস্থানের মহিলা

মহারাষ্ট্রের পুরুষেরা খাটো ধুতি ও বেনিয়ান কোর্তা পরেন। মাথায় বাঁধেন পাগড়ি। মহিলারা কাছা দিয়ে শাড়ি পরেন। কাছা দিয়ে শাড়ি পরার চলন যে শুধু মহারাষ্ট্রের আছে তা নয়। মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি জেলাতেও আছে।



মহারাষ্ট্রীয় মহিলা

দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বাস করেন অন্ধ্র, তামিল নাড়ু, মহীশূর, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে। তামিলদের পোষাকের কথা বললেই দক্ষিণ ভারতীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

তামিলরা একখানা কাপড় ভাঁজ করে লুঙ্গির মত করে পরেন। কাঁধে রাখেন একখানি পাট করা চাদর। এদের সমাজে মাথায় পাগড়ি

বাঁধার রীতিও আছে। তামিল মহিলারাও কাছা দিয়ে রঙ-বেরঙের শাড়ি পরেন।

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে মেঘালয় রাজ্য। এই রাজ্যের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলে খাসিয়ারা বাস করেন। খাসিয়া পুরুষেরা পায়জামা বা প্যাণ্ট ও জামা পরে থাকেন। মাথায় প্রায় সকলেরই পাগড়ি বাঁধা থাকে। খাসিয়া মহিলারা বুকের উপর পর্যন্ত ঢেকে একখানা কাপড় লুঙ্গির মত করে পরেন। তারপর একখানি চাদর কাঁধের উপর দিয়ে সামনে ও পিছনে ঝুলিয়ে দেন। ওদের মাথায় থাকে ওড়না। খাসিয়া মহিলারা যে কাপড় পরেন তার নাম 'মেখলা' ওঁরা যে চাদর ব্যবহার করেন, তার নাম 'রিহা'।



খাসিয়া

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের আলোচনা করলেও এমনি অনেক বৈচিত্র্য চোখে পড়বে। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে; তাই আজকাল সাবেকী পোষাক পরার রেওয়াজ বাড়ছে। সব রাজ্যেই শিক্ষিত লোকেরা সাহেবী পোষাক পরা পছন্দ করেছেন। সাবেকী পোষাকের চলন রয়েছে শুধু গ্রাম্য সমাজে।

ভারতের ভাষা ও লিপি

ভাবের প্রকাশ ভাষায়। একের ভাষা অপরে বুঝতে না পারলে ভাবের আদান-প্রদান হতে পারে না। মানুষে-মানুষে মিলন হতে পারে না। সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। পারে না সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হতে।

আমাদের এই বিশাল ভারতে প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোকের বাস। আদিম কাল থেকে কতো মানব গোষ্ঠীর আনাগোনা এ দেশে। সেই সব মানব গোষ্ঠী এখনও নিজেদের ভাষা ও উপভাষা বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতে প্রায় দু'শটি মূল ভাষা ও সেই সঙ্গে অনেক উপভাষা প্রচলিত আছে।

ভাষাবিদ্‌গণের মতে ভারতের যাবতীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছে চারিটি ভাষা থেকে। সেই চারিটি ভাষা হচ্ছে ঃ

১। আদি আর্যভাষা (ইন্দো-ইউরোপীয়); ২। অস্ট্রিক ভাষা;
৩। দ্রাবিড়ী ভাষা; ৪। ভোট-চীন ভাষা।

প্রাচীনকালে আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা। ক্রমশ সেই ভাষা সরল হয়ে সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়।

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন 'ঋগ্বেদ'। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। প্রকৃত পক্ষে বেদ বলতে বোঝায় 'পবিত্র জ্ঞান'। বৈদিক সাহিত্য বিরাট ঃ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারিটি বেদ। তার মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম রচনা। এতে ১০২৮টি শ্লোক আছে। সূর্য, বরুণ, অগ্নি, ঊষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি বা দেবদেবীর স্তুতিগানই এই সব

শ্লোকের বিষয়বস্তু। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেদ লিখিত আকারে প্রকাশিত হয় নি। হিন্দুরা বংশ-পরম্পরায় শুনে বেদের শ্লোকগুলি মুখস্ত রাখতেন। শুনে মনে রাখতেন বলে বেদের অপর এক নাম 'শ্রুতি'।

ঋগ্বেদের ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার জননী বলা যায়। ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে ক্রমশ অনেক বৈদিক শব্দের প্রয়োগ লোপ পায় এবং প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা জন্ম নেয়। এই নতুন ভাষায় বহু নতুন শব্দ ও অনার্যজাতির ভাষার শব্দ যুক্ত হয়। ফলে এক সমৃদ্ধ ভাষার সৃষ্টি হয়। এর পর 'পাণিনি' তাঁর বিখ্যাত 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ' রচনা করেন। পাণিনির হাতে সংস্কৃত ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়—সংস্কৃত ভাষা পরিশুদ্ধ হয়। এরপর থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বাহক হয় সংস্কৃত ভাষা।

সংস্কৃত ভাষা কিন্তু জনসাধারণের ভাষা হয়ে ওঠেনি। জনসাধারণের ভাষা হলো চলিত ভাষা বা প্রাকৃত ভাষা। পালি ভাষা এমনি এক প্রাকৃত ভাষা। বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষকে ধর্মোপদেশ দিতেন এই পালি ভাষাতেই। বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রগুলি এই পালি ভাষাতেই রচিত হয়।

সম্রাট অশোকও তাঁর ধর্মলিপিগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন। জনসাধারণের জন্যেই তাঁর ধর্মলিপি। তাই সেগুলি জনসাধারণের ভাষাতেই লেখা হয়েছিল।

প্রাকৃত ভাষার মধ্যে আবার স্থানীয় পার্থক্য ছিল। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভেদে ভারতের চার অঞ্চলের চার রকমের প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল। সেই সব প্রাকৃত ভাষার ধ্বনির পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই অপভ্রংশ ভাষাগুলি থেকেই আধুনিক ভারতের আর্যভাষা-

গুলির সৃষ্টি হয়। এই ভাষাগুলি হচ্ছে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি।

ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের বাস। তাদের ভাষা তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কানাড়ী। এই সব ভাষার সঙ্গে উত্তর ভারতের ভাষার কোন মিল নেই বললেই চলে। তবে পরবর্তী-কালে অনেক শব্দ এই সব দক্ষিণী ভাষাতেও স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে মালয়ালাম ভাষা সংস্কৃত শব্দে বেশী সমৃদ্ধ।

ভারতের অনেক জায়গাতেই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত আছে। এই ভাষার আবার দুটি উপশাখা আছে; যেমন মুণ্ডা ও কোল ভাষাগোষ্ঠী এবং মোন্-খ্‌মে্‌ ভাষাগোষ্ঠী। বিহারের ছোটনাগপুরে, উড়িষ্যায় এবং মধ্যপ্রদেশেই প্রধানত মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ভাষা ছড়িয়ে আছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, ভুমিজ, হো, কোরওয়া প্রভৃতি ভাষাগুলির সাদৃশ্য খুব বেশী। এদের খেরওয়ারী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুণ্ডা বা কোলগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার মধ্যে খড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদবা, কুরকু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খড়িয়া ভাষা ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় প্রচলিত। জুয়াং, শবর ও গদবা উড়িষ্যায় প্রচলিত। কুরকু ভাষা প্রচলিত মধ্যপ্রদেশে। আসামের খাসিয়াদের খাসী ভাষা এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভাষা মোন্-খ্‌মে্‌ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

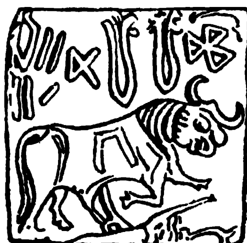
হিমালয় অঞ্চলে ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর কতকগুলি ভাষা এবং উপভাষা প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে ধীমাল, থামী, লিম্বু, চম্বা, লাহুলী, কনাসী, কনৌরী, গুরুং, বেওচা প্রভৃতি ভাষার নাম উল্লেখ-যোগ্য। হিমালয় অঞ্চলের এই ভাষাগুলি দার্জ্জিলিং হতে শুরু করে নেপালের মধ্য দিয়ে কানওয়ার, কুলু, লাহুল, কাংড়া, চম্বা প্রভৃতি

অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই সব ভোট-বর্মী ভাষার কতকগুলির সঙ্গে মুণ্ডা বা কোল ভাষাগোষ্ঠীর কিছু মিল আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই বিশাল ভারতে ভাষার যেন মেলা বসেছে।

ভাষার প্রকাশ হয় বর্ণমালা বা লিপিতে। কাজেই ভাষা প্রসঙ্গে লিপির কথা আপনা-আপনি এসে পড়ে। তাই লিপির কথাও একটু আলোচনা করা দরকার। ভারতের প্রাচীনতম লিপি হচ্ছে হরপ্পা-লিপি। কিন্তু এই হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নি।

'হরপ্পা' পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলাতে; বর্তমানে এ স্থানটি পাকিস্তানের অন্তর্গত। এখানকার ভূগর্ভ খুঁড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার অনেক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেইসব নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে এখানে একটি বিরাট নগর ছিল। হরপ্পা লিপির বহু নিদর্শন পাওয়া



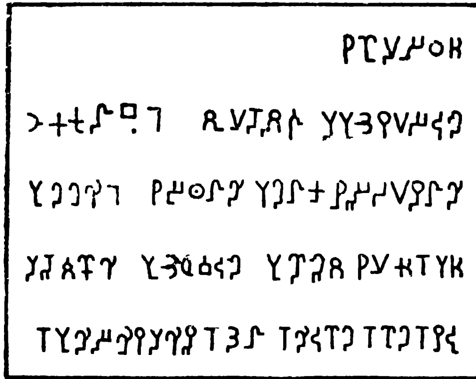


হরপ্পার শিলমোহর

গেছে। কিন্তু সেগুলি কোন শিলাখণ্ডে বা ভূর্জপত্রে লেখা নয়—সেগুলি সাধারণত ছোট ছোট সিল এবং ফলকের উপর উৎকীর্ণ।

যাই হোক এই হরপ্পা-লিপির পর অশোকের শিলালিপিই ভারতীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। সম্রাট অশোক তাঁর ধর্মলিপি 'ব্রাহ্মী' ও 'খরোষ্ঠি' এই দুই লিপিতে উৎকীর্ণ করেছিলেন। এই

লিপির উৎকর্ষ দেখে মনে হয় যে, দীর্ঘকাল ধরে এ লিপি গড়ে উঠেছিল। অশোকের শিলালিপির মধ্যে দু-একটি খরোষ্ঠিতে লেখা,



ব্রাহ্মী লিপিতে অশোকের শিলালিপি

বাকী সব ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। খরোষ্ঠি লিপি সেকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে ব্রাহ্মী লিপি থেকেই ক্রমশ দেবনাগরী বা নাগরী হরফের সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মী লিপির দুইটি পৃথক রূপ গড়ে উঠেছিল। উত্তর ভারতীয় রূপ থেকে বাংলা, দেবনাগরী ও এদের সমশ্রেণীর লিপিগুলির উদ্ভব হয়েছিল। আর দক্ষিণ ভারতীয় রূপ থেকে তামিল, তেলুগু, কানাড়ী প্রভৃতি লিপি জন্ম নিয়েছিল। কাজেই ব্রাহ্মী লিপিকেই যাবতীয় ভারতীয় লিপির জননী বলা যায়।

আমাদের দেশে কতো না ভাষা! কিন্তু বেশীর ভাগ ভাষাতেই কথা বলার লোক অল্প। সেই কারণে ভারতীয় সংবিধানে মোট পনেরটি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই পনেরটি ভাষা হচ্ছে ঃ

১। বাংলা ২। অসমীয়া ৩। গুজরাটী ৪। উর্দু
৫। কানাড়ী ৬। কাশ্মীরী ৭। মালয়ালাম ৮। মারাঠী
৯। ওড়িয়া ১০। পাঞ্জাবী ১১। সংস্কৃত ১২। তামিল
১৩। হিন্দী ১৪। তেলুগু ১৫। সিন্ধী।

পৃথিবীর মধ্যে চীনের মান্দারিন ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তারপরই নাম করতে হয় ইংরেজী ভাষার। হিন্দীর স্থান তৃতীয়। পৃথিবীর প্রায় ১৬ কোটি মানুষ হিন্দীভাষায় কথা বলেন। ভারতের অঞ্চলভেদে হিন্দী ভাষাতেও আবার তারতম্য দেখা যায়। তবে ভারতে 'খড়িবুলি'কে হিন্দী ভাষার আদর্শমান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতে ভাষার বৈচিত্র্য একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে, অপরদিকে আবার নানা সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। সর্বভারতীয় ভাষা একটি হলে ভাবের আদান-প্রদানে সুবিধা হতো— সুবিধা হতো জাতীয়তাবোধ সংগঠনে ; আর সহজতর হতো অনেক কাজ।

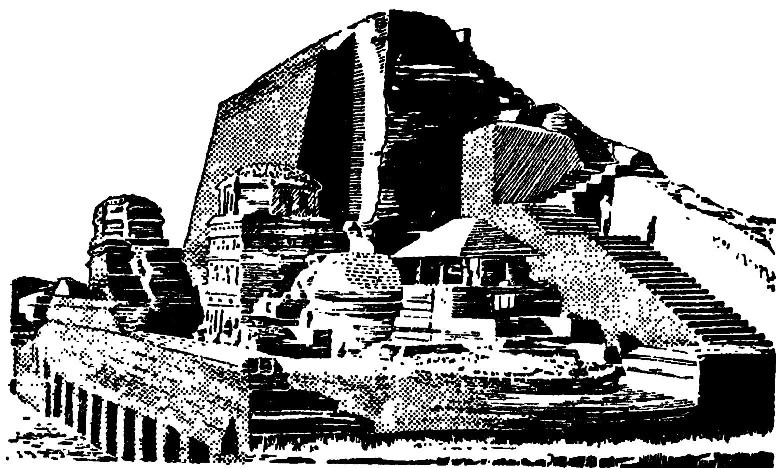
ভারতের বেশীর ভাগ লোকই হিন্দী ভাষা বোঝে। তাই ভারতীয় সংবিধানে ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষারূপে হিন্দীকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ হলো দেবনাগরী হরফযুক্ত হিন্দী। সেই সঙ্গে ভারতীয় রাশিমালার আন্তর্জাতিকরূপ অর্থাৎ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং 0 ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানের নির্দেশে ভারতে হিন্দীর সঙ্গে সরকারী ভাষারূপে ইংরেজীও চলছে।

কাজেই ভাষার ক্ষেত্রেও ভারতে সেই সনাতন রীতি বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। সে রীতি হচ্ছে—'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।

ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা-দীক্ষায় বরাবরই ভারত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী ছিল, এখনও আছে। বর্তমানে ভারতে অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় শিক্ষারই শিক্ষায়তন আছে। প্রাচীন ভারতে এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না সত্যি, তবে যে কয়টি ছিল—সব কটিই বেশ বড় এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে নালন্দা অন্যতম। নালন্দাকে ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুধু



নালন্দার বর্তমান অবস্থা

প্রাচীন নয়—খ্যাতি ও গৌরবের দিক থেকেও সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নালন্দা ছিল শ্রেষ্ঠ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই

বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিদ্যার্থীর সমাগম হতো। এই সব বিদ্যার্থীরা আসতেন সুদূর চীন, তিব্বত, কোরিয়া, যবদ্বীপ. সুমাত্রা, ব্রহ্মদেশ ও তুর্কীস্থান থেকে। সবাই এখানে আসতেন জ্ঞান আহরণের জন্যে। কাজেই নালন্দার কথা জানলে সেকালের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মোটা-মুটি একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ—যার বর্তমান নাম রাজগীর। রাজগীর বর্তমানে বিহারের পাটনা জেলায় অবস্থিত। এই রাজগীরেরই সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামক স্থানে এককালে গড়ে উঠেছিল নালন্দা-বিহার। 'বিহার' শব্দের অর্থ—একজন ভিক্ষুর বাসের জন্যে একটি স্বতন্ত্র কক্ষ। পরে অবশ্য 'বিহার' অর্থে বোঝাতো এমন এক মঠ, যেখানে কতিপয় ভিক্ষু একত্রে বাস করেন। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই বিহারগুলিই পরবর্তী কালে এক-একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

বিহার গড়ে ওঠার আগে নালন্দা ছিল এক অখ্যাত পল্লী। কিন্তু এই পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল মনোরম। শৈলগিরি, ছটাগিরি বিপুলগিরি প্রভৃতির পার্বত্য শোভায় এই পল্লী ছিল শ্রীমণ্ডিত। শোনা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ নাকি পুরাকালে এই পল্লীরই 'লেপ' নামে এক ধনী ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় বণিকেরা তখন দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে এখানকার জমি কিনেছিলেন। তারপর তা মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে ভগবান বুদ্ধকে দান করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পদরেণু স্পর্শে ধন্য এই পল্লী অঞ্চলে সেকালে বৌদ্ধদের কাছে ছিল এক অতি পবিত্র স্থান।

এ ভিন্ন বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্তের জন্মস্থানও এই নালন্দা। ভগবান তথাগত এবং তাঁর প্রিয় শিষ্যের স্মৃতি বিজড়িত স্থান

বলে পুণ্যলোভী বৌদ্ধদের দৃষ্টি পড়ে নালন্দার উপর। আবার রাজানুগ্রহলাভ করারর ফলে ছোট্ট নালন্দা-বিহার শীঘ্রই এক মহাবিহারে পরিণত হয়। কালক্রমে সেই মহাবিহার রূপান্তরিত হয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।

'নালন্দা' নামটা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, যে এখানকার 'নাগনন্দ' সরোবর থেকেই নালন্দা নামের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, বুদ্ধদেব তাঁর কোনও এক জন্মে এখানে বাস করতেন। তখন তিনি ছিলেন খুব বড় একজন দাতা। 'ন-অলম্-দা' অর্থাৎ কিনা অবিশ্রান্ত দাতা—এই অর্থে বুদ্ধদেবকে 'নালন্দা' উপাধি দেওয়া হয়। সেই থেকে জায়গাটির নাম হয় নালন্দা।

খ্রীষ্টাব্দ শুরু হবার আগে শিক্ষা জগতে নালন্দার বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। অবশ্য, তারপর মহাযান-বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নালন্দা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পিছনে ছিল গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মুক্তহস্তে দান। গুপ্ত সম্রাটরা হিন্দু ছিলেন কিন্তু এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তোলার জন্যে তাঁদের চেষ্টার সীমা ছিল না। সম্রাট কুমারগুপ্ত এবং তাঁর বংশধরেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করে গেছেন।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ষোল বছর নালন্দায় ছিলেন। তাঁর বিবরণী পড়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি নালন্দা সম্পর্কে। জানতে পারি, এই বিহারের উত্তর-পূর্ব দিকের স্তূপটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা বলাদিত্য। সেখানে বসে বুদ্ধদেব নাকি ধর্মপ্রচার করতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।

এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা শক্রাদিত্য। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নালন্দার খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার পাল রাজারা এবং কনৌজের রাজা যশোবর্মা নালন্দায় প্রচুর অর্থ দান করেন। সেকালের অনেক ধনী ব্যক্তিও মুক্ত হস্তে নালন্দায় দান করেছিলেন।

গুপ্ত রাজারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একশতটি গ্রাম দান করেছিলেন। পরে আরও একশতটি গ্রাম দান হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। এই সব গ্রাম থেকে বিদ্যার্থীদের জন্য পাওয়া যেতো চাল, দুধ, সবজী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য। এখানে বিদ্যার্থীরা বেশ সুখেই থাকতেন। অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসার জন্যে তাঁদের কোন চিন্তাই করতে হতো না। নালন্দায় ছিল অবৈতনিক আবাসিক শিক্ষা। কাজেই বিদ্যার্থীরা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করতেন। আহার ও বাসস্থানের জন্যেও তাঁদের কোন কিছু ব্যয় করতে হতো না।

হিউয়েন সাঙের আমলে নালন্দায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। অধ্যাপক ছিলেন প্রায় এক হাজার। এখানকার অধ্যাপকদের উপাধ্যায় বলা হতো। অধ্যাপকেরা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন; ছাত্রদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন; ছাত্রাবাস পরিচালনা করতেন। নালন্দায় সেকালে তিনজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম জন অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় জন উপাধ্যক্ষ এবং তৃতীয় জন স্থবির বা প্রধান উপাসক। বিভিন্ন সময়ে নালন্দার যাঁরা অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মহাপণ্ডিত। এই সব অধ্যক্ষদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, জিনমিত্র ও শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। নালন্দার ইতিহাস সুদীর্ঘ সাতশো বছরের ইতিহাস। এই দীর্ঘকালের মধ্যে নিয়মভঙ্গের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের সঙ্গে সর্বদা সহযোগিতা করতেন।

সাতশো বছর ধরে নালন্দা ভারত তথা প্রাচ্যের জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল। এখানকার শিক্ষাদান প্রণালী খুব সুন্দর ছিল। তাই দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা জ্ঞানলাভের আশায় এখানে ছুটে আসতেন। আবার নালন্দার অনেক পণ্ডিত এবং অধ্যাপক ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী বয়ে নিয়ে যেতেন বিদেশে।

নালন্দা শুধু বিদ্যার্থীদেরই আকর্ষণ করেনি, অনেক পর্যটক ও পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আকৃষ্ট করেছিল। এখানে কোরিয়া থেকে এসেছিলেন আর্যবর্মা ; তিব্বত থেকে এসেছিলেন সেখানকার রাজমন্ত্রী থনমি ; চীন দেশ থেকে এসেছিলেন তাওহি, ট্যাং, হিউয়েন সাং, ফা-হিয়েন, আই সিং ও আরও অনেকে। এঁরা সবাই নালন্দায় এসেছিলেন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানে।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে ছিল আটটি বড় কক্ষ ও তিন শতেরও বেশী সাধারণ কক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপনিবেশটির নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। ধর্মগঞ্জে একটি বিখ্যাত গ্রন্থগার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছিল সুন্দর পুষ্করিণী। উপাধ্যায় ও ভিক্ষুদের বাসগৃহে পাথরের শয়নবেদী থাকতো। দেওয়ালের গায়ে থাকতো কুলুঙ্গি। দুটি কুলুঙ্গির একটিতে থাকতো পুঁথি অপরটিতে প্রদীপ। উপাধ্যায়দের মত ভিক্ষুদেরও অধ্যাপনার কাজ করতে হতো ; পুঁথি লিখতে হতো ; পুঁথির লেখা নকল করতে হতো ; অতি প্রত্যুষে বিদ্যার্থীরা শয্যাত্যাগ করতেন। তারপর নিজ নিজ উপাধ্যায়ের সেবা করতেন। তারপর শুরু হতো তাঁদের পড়াশুনা। সর্বপ্রথম পড়তে হতো ধর্মশাস্ত্র।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ছিল ষোলটি বিষয়। সেই ষোলটি বিষয় হচ্ছে :—

১। চতুর্বেদ ; ২। হীনযান ধর্মগ্রন্থ ; ৩। মহাযান ধর্মগ্রন্থ ;
৪। সাংখ্যদর্শন ; ৫। তত্ত্বনিচয় ; ৬। ন্যায়শাস্ত্র ;
৭। ব্যাকরণ ; ৮। অধ্যাত্মবিদ্যা ; ৯। চিকিৎসাবিদ্যা ;
১০। শিল্পস্থান বিদ্যা ; ১১। যোগশাস্ত্র ; ১২। জ্যোতিষবিদ্যা ;
১৩। ধাতুবিদ্যা ; ১৪। তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র ;
১৫। রসায়নবিদ্যা ; ১৬। যাদুবিদ্যা।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। তবে বিশ বছরের কম বয়সের কোন বিদ্যার্থীকে ভর্তি করা হতো না। এখনকার মত তখনও ভর্তির আগে বিদ্যার্থীকে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হতো। সে পরীক্ষা ছিল বেশ কঠিন। যাঁরা এই পরীক্ষা গ্রহণ করতেন তাঁদের বলা হতো 'দ্বার-পণ্ডিত'।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো। বক্তৃতা অভ্যাস, মৌলিক প্রবন্ধ রচনা এবং বিতর্কের ব্যবস্থাও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন তাঁকে 'কুলপতি' উপাধি দেওয়া হতো। কুলপতির নীচের উপাধির নাম ছিল 'পণ্ডিত'।

পৃথিবীতে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়—কালক্রমে নালন্দাও তাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাটি খুঁড়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। সে নালন্দা আজ আর নেই বটে, তবে তার খ্যাতি আজও অম্লান। অতীতে শিক্ষা-দীক্ষায় ভারত যে কতো উন্নত ছিল—নালন্দা তার সাক্ষ্য দেয়।

ভারতের বিজ্ঞান সাধনা

প্রাচীন ভারত পৃথিবীকে শুধু বেদ, বেদান্ত, দর্শন ও উপনিষদের বাণীই শোনায় নি—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক নতুন তত্ত্বও জানিয়েছে। বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত অসামান্য উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতের সেই বিজ্ঞান-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু আমাদের সবারই জানা দরকার।

প্রথমেই আসা যাক আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের কথায়। ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সেকালে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের একটি উপাঙ্গ রূপে গড়ে উঠেছিল। সে কারণে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রকে 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়। আয়ুর্বেদের নানান শাখা ছিল। যেমন—শস্ত্র-চিকিৎসা, কায়-চিকিৎসা, শিশুরোগ-চিকিৎসা, শারীর-বিদ্যা, বিষ চিকিৎসা প্রভৃতি। আয়ুর্বেদের সব বিভাগেই বহু গবেষণা হয়েছিল।

সেকালের আত্রেয়, কাশ্যপ, হারীত, অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের জনকরূপে পরিচিত ছিলেন। আর চরক, সুশ্রুত, ধন্বন্তরি প্রভৃতি বৈদ্যগণ এই শাস্ত্রের সংস্কার সাধন করেছিলেন। আয়ুর্বেদের দৌলতেই সেকালে পশু-চিকিৎসার সূত্রপাত হয়েছিল। সেকালে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের উপর কয়েকখানি ভাল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা উল্লেখযোগ্য।

চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায় স্পষ্টভাবেই লেখা আছে যে রক্ত হৃৎপিণ্ড হতে বেরিয়ে ধমনীগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর

সারা শরীর ঘুরে আবার হৃৎপিণ্ডেই ফিরে আসে। গর্ভস্থ শিশুর রক্ত-প্রবাহ মায়ের হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, সেখান থেকে আবার তা গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ডেই ফিরে আসে—এ সব তত্ত্ব ভারতের বহু বছর আগে আবিস্কৃত হয়েছিল। এ কথা ভাবলে অবাক হতে হয়!

আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ তৈরিরও প্রয়োজন হয়েছিল। সেই প্রয়োজনের তাগিদে এ দেশে ধীরে ধীরে রসায়ন বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। রসায়ন-শাস্ত্রে প্রাচীন ভারত খুবই উন্নতি করেছিল। একথা আমরা জানতে পারি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিরচিত 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক ইংরেজী গ্রন্থখানি পাঠ করে। নাগার্জুন ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ। তাঁর রচিত 'রসরত্নকর' গ্রন্থখানি প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন-শাস্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

পারদ নিয়ে ভারতীয় রসায়নবিদেরা সেকালে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে পারদের সঙ্গে গন্ধক যুক্ত হলে পারদের উপকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়। সে পারদ তখন ওষুধ হিসাবে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়।

সেকালের ভারতীয় রসায়নবিদেরা ঊর্ধ্বপাতন, পাতন, ছাঁকন প্রভৃতি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সোনা, রূপা ও রত্নাদির পরীক্ষা ও মুল্য নিরূপণ করতে জানতেন। জানতেন খনিজ আকরিক হতে ধাতু নিষ্কাশন করতে। জানতেন সংকর ধাতু প্রস্তুত করতে। বহুবিধ ধাতুর ব্যবহারও তাঁদের জানা ছিল। রঞ্জন শিল্পে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। দিল্লীর কুতব মিনারের কাছে মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দিরে ব্যবহৃত মরিচাহীন দীর্ঘ লৌহস্তম্ভ আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

হাজার হাজার বছর আগে বিজ্ঞানের শৈশবকালে ভারতে তৈরি হয়েছিল ঐ সব মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ। ধাতুশিল্পে প্রাচীন ভারত যে কতো উন্নত ছিল—এ সব নিদর্শন তারই সাক্ষ্য দেয়।

ভারতের দার্শনিক কণাদ প্রথম পরমাণুবাদ প্রবর্তন করেন। আবার শব্দ সঞ্চারণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত আজও বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যার অস্তিত্ব আছে, তার সর্বাঙ্গীণ ধ্বংস কখনই সম্ভব নয়—এ উক্তি আছে আমাদেরই সাংখ্য দর্শনে। সাংখ্য দর্শনের এই তত্ত্বই বর্তমান যুগে পদার্থের 'নিত্যতা সূত্র'রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারত খুবই উন্নত ছিল। হিন্দুদের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের সূচনা হয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে। বৈদিক যুগে দেবতাদের পূজার জন্য যে সব মন্ত্র-পাঠ করা হতো তাতে পৃথিবীর আকার-প্রকার, নক্ষত্রদের গতিবিধি কাল-গণনা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ থাকতো। বেলি সাহেব বলেছেন, যে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করতে জানতেন।

হিন্দুদের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে রচিত হয়। এতে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বিষয় উল্লেখ আছে। বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট বলে গেছেন: পৃথিবী নিজ কক্ষে নিজ মেরুদণ্ডের উপর প্রত্যহ ঘুরছে। আর সে সূর্যের চারিদিকে বছরে একবার করে ঘুরছে। আর তারকারা আছে নিশ্চল হয়ে। পৃথিবীর গতি আছে বলেই নক্ষত্রদের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান আমরা বুঝতে পারি। এইখানেই শেষ নয়। পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে আর্যভট্টের তত্ত্ব বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বও যে অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মনে স্থান পেয়েছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আমাদের বরাহ-মিহির বলে গেছেন যে, পৃথিবী সব বস্তুকেই কেন্দ্রের দিকে অবিরত আকর্ষণ করছে। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মে সব বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হয়।

বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য আবির্ভূত হন ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অয়নাংশ নির্ণয়, লম্ব নির্ণয়, গ্রহ-গণনা প্রভৃতি অনেক দুরূহ বিষয় নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষের দুখানি অনবদ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'সূর্য সিদ্ধান্ত' ও 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' এই দুই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে সেকালের ভারতীয় পণ্ডিতেরা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিখুঁত সময় নির্ধারণ করতে পারতেন। পারতেন চন্দ্র ও সূর্যের পরিবর্তিত আকার নির্ধারণ করতে। রাশি বিভাগের দ্বারা কালগণনার পদ্ধতি হিন্দু জ্যোতির্বিদদেরই দান।

বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরা প্রায়ই যাগ-যজ্ঞ করতেন। তাঁদের যজ্ঞবেদী নানা আকৃতির হতো। শোনা যায় যে এইসব যজ্ঞবেদী রচনা থেকেই জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।

গণিতে প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে মৌলিক দান হচ্ছে এক (১) থেকে শূন্য (০) পর্যন্ত দশটি চিহ্নের দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার। মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে ভারতের এ দানের কথা চিরকাল লেখা থাকবে।

আমাদের আর্যভট্ট বৃত্ত, ছায়া, ক্ষেত্রফল, মূলাকর্ষণ, জ্যামিতিক প্রগতি, বীজগাণিতিক অভেদ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করে গেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বর্গমূল, ঘনমূল, ত্রৈরাশিক, কুসীদ, সমকোণী

ত্রিভুজ, বৃত্তাংশ, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশি বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। কাজেই গণিত শাস্ত্রে এঁদের দান অনন্যসাধারণ।

মহেঞ্জোদরোতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারত সুদূর অতীতে বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তখনকার দিনের পয়ঃপ্রণালী, অট্টালিকা, নগর-পত্তন প্রভৃতির নিদর্শনগুলি উন্নত ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞান-সাধনায় প্রাচীন ভারতের সেই উন্নত ঐতিহ্য আজও অব্যাহত আছে। বিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ও ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ খোরনা নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। 'বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' আবিষ্কার করে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। উদ্ভিদের চেতনাতত্ত্ব আবিষ্কার করে জগদীশচন্দ্র বসু চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

স্বাধীন ভারতে আজ অসংখ্য বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এ সকল কেন্দ্রে বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই আধুনিক পর্যায়ের গবেষণা হচ্ছে। এমন কি পারমাণবিক শক্তি নিয়েও ভারতে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে ভারত শান্তি ও অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী। তাই সে পারমাণবিক শক্তিকে মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায় না—চায় মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে। বিজ্ঞানকে ভারত মানুষের অভিশাপরূপে দেখতে চায় না—চায় আশীর্বাদরূপে দেখতে। ভারতের বিজ্ঞান সাধনার একমাত্র আদর্শ হচ্ছে ঃ

॥ বিজ্ঞান অভিশাপ নয়—আশীর্বাদ ॥

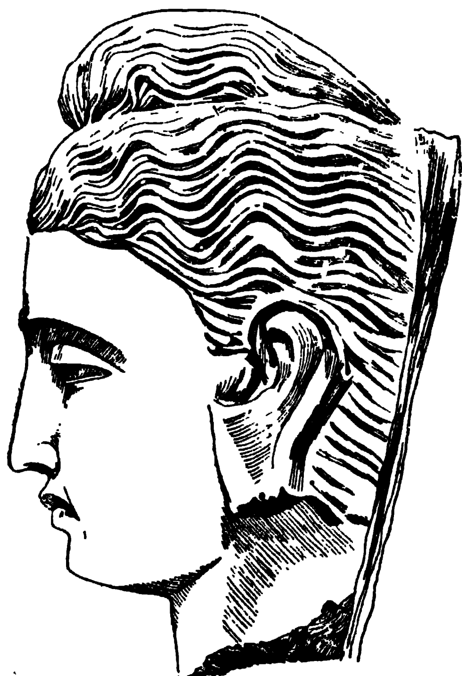
গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ—অনেক বিদেশীই ভারতে রাজ্য লোভে এসেছে। কিন্তু তারা কেউ ঠিক বিদেশীর মত এখানে রাজত্ব করতে পারে নি। পারে নি ঠিক বিদেশীর মত নির্লিপ্তভাবে ফিরে যেতে।

যারা তরবারি দিয়ে ভারতকে আঘাত করেছে, ভারত তাদের প্রতিঘাত করেছে। তবে তরবারি দিয়ে নয়, নিজের উদার ভক্তি-প্রীতির মানব-ধর্ম ও সংস্কৃতি দিয়ে। আঘাত সহ্য করে ভারত আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। বিদেশীরা কিন্তু প্রতিঘাত সহ্য করতে পারে নি। গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ—সবাই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় হয়ে গেছে। ভারতও অপরদিকে বিদেশী সংস্কৃতির ভাবগত সম্পদ আত্মসাৎ করে সমৃদ্ধ হয়েছে।

গ্রীক রাজা মিনাণ্ডারের রাজধানী ছিল 'শাকল' (বর্তমানে পাকিস্তানের শিয়ালকোট)-এ। ভারতে রাজত্ব করতে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেকালের অনেক গ্রীক রাজা আবার 'ধার্মিক' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। হেলিওডোরস নামে এক গ্রীক দূত পরম বিষ্ণুভক্ত হয়ে এক গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। বিদিশায় এই গরুড়-স্তম্ভ এখনও দেখা যায়।

সে যুগে সীমান্ত প্রদেশে গ্রীক শিল্পী ও ভাস্করেরা বুদ্ধমূর্তি গড়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে গ্রীক ও ভারতীয় রীতির মিলনে শিল্পকলায় গড়ে উঠেছিল 'গান্ধার রীতি'। এই রীতিতে প্রস্তুত বুদ্ধ

মূর্তিগুলি ভারতীয় ভাস্কর্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শক ও কুষাণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পচর্চা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধগয়া, মথুরা, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে গান্ধার-শিল্পের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রও আবার গ্রীক জ্যোতিষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; এর প্রমাণও আছে। আবার পণ্ডিতেরা বলেন যে ভারতীয় দর্শন গ্রীক দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।



গান্ধার শিল্পের-নিদর্শন

সম্রাট কনিষ্ক কুষাণ জাতির লোক হলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পেশোয়ারের কাছে তিনি একটি চৈত্য বা মঠ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই বুদ্ধমূর্তি পূজা আরম্ভ হয়। আর গ্রীক শিল্পীরা বুদ্ধমূর্তি গড়ে সেই পূজার সূচনা করেন।

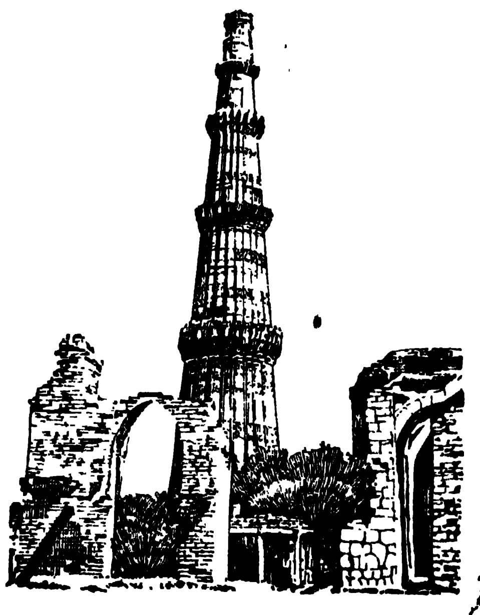
বুদ্ধদেব নিজে কিন্তু মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। সম্রাট অশোকও তাই। কিন্তু কনিষ্কের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা সুরু হয়। মূর্তিপূজাযুক্ত বৌদ্ধধর্মের নাম হয় 'মহাযান' ধর্ম। পুরানো বৌদ্ধধর্ম মূর্তিপূজার বিরোধী; সে ধর্ম 'হীনযান' বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত।

কনিষ্কের সময় থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

হিন্দুধর্মে দেব-দেবীর মূর্তি পূজা অনেকদিন ধরেই হয়ে আসছে। এখন বৌদ্ধধর্মেও তার প্রচলন হলো। ফলে ভারতের জনমানসে এই দুই ধর্মের ব্যবধান অনেকটা ঘুচে গেল। এমনিভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মিলন ঘটালেন এক বিদেশী। এ কথা ভাবতেও অবাক হতে হয়!

ভারতে হিন্দুর পর আসে মুসলমান যুগ। সে যুগের হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক বিরাট নিদর্শন আজও রয়ে গেছে। তা হচ্ছে উর্দু ভাষা। ফারসী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-শিল্পনীতির সমন্বয়ও ভারতীয় সংস্কৃতির আর এক বৈশিষ্ট্য। আরব, তুর্কী, পারসিক প্রভৃতি মুসলমানেরা বিভিন্ন সময় ভারতে আসেন। তাঁরা সঙ্গে করে আনেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পরীতি। তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরাতি মিলিত হয়ে এক বিচিত্র ভারতীয় স্থাপত্য-



কুতব মিনার

রীতি গড়ে ওঠে। সেই স্থাপত্যের নিদর্শন ভারতে অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে। দিল্লীর কুতব মিনার, আলাই দরওয়াজা এবং গৌড়ের শেখানা মসজিদ সেই স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্ম-সংস্কারকদের দানও কম নয়। এই সব ধর্ম-সংস্কারকদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নানক, নামদেব


শ্রীচৈতন্য


গুরু নানক


কবীর

শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন মানবিক প্রীতি ও প্রেমের মন্ত্রে এঁরা সবাই হিন্দু ধর্মের জড়তা ভেঙেছিলেন। তাকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ঘাত-প্রতিঘাতে এঁরা সবাই ব্যথিত হয়েছিলেন। ধর্মের নামে হানাহানি যে মিথ্যা—এই কথাই তাঁরা সবাইকে বলতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল ঃ

॥ মানুষের জন্য ধর্ম—ধর্মের জন্য মানুষ নয় ॥

কবীরের ভক্ত দাদু বলেছিলেন ঃ

'সব ঘট একৈ আত্মা,
ক্যা হিন্দু-মুসলমান ?'

অর্থাৎ সকলেরই আত্মা এক ও অভিন্ন। হিন্দু, মুসলমান—এ সব আবার কি!

কবীর, নানক, দাদু—সকলেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে, ছোঁয়াছুঁয়ির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মুসলমান যুগে তাই করেছিলেন। এঁদের মিলিত চেষ্টায় ভারত-সংস্কৃতি ঐতিহাসিক সমন্বয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

ভারতে বিদেশীদের মধ্যে সবার শেষে আসে ইংরেজ। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ইংরেজরা ভারত শাসন করে। সেই সময় ইউরোপীয় ভাবধারা ভারতে আসে। ফলে ভারতের সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি তার প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত হয়। ইয়োরোপীয়দের সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছুই ভারতীয়রা গ্রহণ করেছে। তবে বেশী উপকৃত হয়েছে দুটি জিনিস গ্রহণ করে :

১। ইংরেজদের অদম্য উৎসাহ ও উন্নতির চেষ্টা ; আর

২। স্বাধীনতা স্পৃহা ও গণতন্ত্রে অটুট বিশ্বাস।

ভারত সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষেই ইংরেজ শাসনের প্রধান দান।

আজকাল আমরা 'পঞ্চশীল' নীতির কথা প্রায় শুনতে পাই। এই পঞ্চশীল নীতি বর্তমান ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অঙ্গ। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় 'বান্দুং সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার ঊনতিরশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পঞ্চশীল নীতি মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দেন। আমাদের গৌরব যে—এই পঞ্চশীল নীতির উদ্ভব ঘটেছে ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে।

'শীল' কাকে বলে ?

শীল হচ্ছে আমাদের চলার সম্বল বা নীতি। বুদ্ধদেব বলেছেন—শীলের দ্বারা চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল গ্রহণ করাই মুক্তিলাভের উপায়। কারণ শীলগুলি হচ্ছে মঙ্গল। আর মঙ্গল লাভই মুক্তির সোপান। মঙ্গল লাভ করতে হলে মৈত্রী ভাবনার প্রয়োজন। প্রতি দিন ভাবতে হবে যে, সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংস হোক। এই মৈত্রী ভাবনার দ্বারা মানুষের চিত্তকে প্রসারিত করতে হবে।

বৌদ্ধদের এই শীল-সাধনা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক পঞ্চশীল নীতির। পঞ্চশীলের মূল কথা শান্তি ও মৈত্রী। পঞ্চশীলের পাঁচটি শীল বা নীতি হচ্ছে ঃ

১। প্রত্যেক রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতা বজায় রাখা ;
২। কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ না করা ;
৩। কোন রাষ্ট্রের ভেতরকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ;
৪। সব রাষ্ট্রকে সমান মনে করে পরস্পর সাহায্য করা ; এবং
৫। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি মেনে চলা।

যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জগতে ভারতের এই সংস্কৃতি বাণী একদিন জগতের মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে। সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতিই জগতের সংস্কৃতি হবে। তখন কবি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে এক সুরে বলতে ইচ্ছা হবে ঃ

'বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

ভারতের জাতীয় দিবস

প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই কয়েকটি পবিত্র দিন থাকে, চিরস্মরণীয় দিন থাকে। সেই দিনগুলিকে বলা হয় জাতীয় দিন। আমাদের ভারত রাষ্ট্রেও এমনি কয়েকটি দিন আছে। ভারত সরকার সেই সব কটি দিনকে 'জাতীয় দিবস'-এর মর্যাদা দিয়েছেন। ভারতের জাতীয় দিবসগুলির মধ্যে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও সর্বোদয় দিবস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এককালে ভারত ছিল পরাধীন। প্রায় দুশো বছর ধরে বিদেশী ইংরেজ শাসক এ দেশকে শাসন করেছিল। ইংরেজ সরকার আমাদের শাসন করেছে—সেই সঙ্গে শোষণও করেছে। নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে তারা আমাদের দেশের সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে। অমানুষিক অত্যাচার করেছে তারা ভারতীয় প্রজাদের উপর।

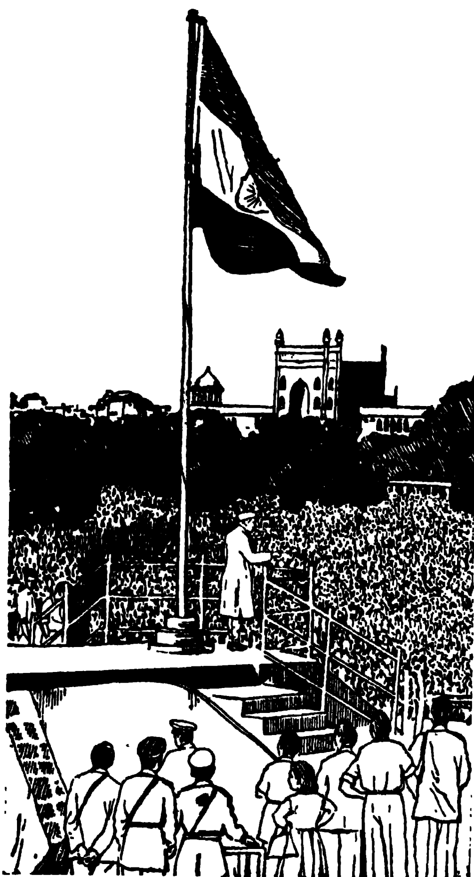
ভারতবাসী যেদিন বুঝলো পরাধীনতার গ্লানি কি—সেইদিন থেকে তারা সংগ্রাম শুরু করলো। সে সংগ্রাম স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে ইংরেজ সরকার নানা রকম অত্যাচার চালিয়েছে। নানা ভাবে ভারতবাসীদের উৎপীড়ন করেছে। তাতে আমাদের দেশের বহু নেতা লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন।

দীর্ঘকাল স্বাধীনতা আন্দোলন চলার পর ইংরেজরা বুঝতে পারে যে ভারতবাসী কাপুরুষ নয়—অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা তাদের

দাবিকে দমিয়ে রাখা যাবে না। কাজেই শেষে ইংরেজদের এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। ভারতকে দিয়ে যেতে হয় স্বাধীনতা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক দিন। ঐ দিন আমাদের দেশের শাসনভার আমাদের হাতে তুলে দেয় ইংরেজরা। তারপর তারা ফিরে যায়। আমাদের দুশো বছরের সংগ্রাম, আমাদের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ সেই দিন সার্থক হয়। সেই দিনটি আমাদের স্বাধীনতা লাভের দিন—জাতির সেরা দিনগুলির অন্যতম।



লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান

প্রতি বছর ১৫ই অগস্ট তারিখে আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করি। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করি। ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে আমরা আনন্দ-উৎসব করি। সবাই জাতীয় পতাকা ওড়াই, জাতীয় সংগীত গাই। রাত্রে আলোক মালায় সাজিয়ে দিই গোটা দেশটাকে। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতির

আয়োজন করি। সেখানে জাতীয় পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে দেশমাতার বন্দনা গান গেয়ে শপথ নিই। শপথ নিই—আমাদের পাওয়া স্বাধীনতাকে রক্ষা করার। আর সেই সঙ্গে স্মরণ করি সেই সব বীর শহীদদের—যাঁরা দেশের পরাধীনতার গ্লানি ঘোচাবার জন্য প্রাণ দিয়েছেন—আত্মত্যাগ করেছেন।

এরপর প্রজাতন্ত্র দিবস—২৬শে জানুয়ারি। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি আমাদের দেশ এক বিরাট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আবার এই দিন থেকেই আমাদের নব রচিত সংবিধান এদেশে চালু হয়েছে। কাজেই ২৬শে জানুয়ারি তারিখটি আমাদের জাতীয় জীবনের একটি শুভ দিন। জাতির জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে ঐ দিনটির স্মৃতি জড়িত।

আমাদের দেশ আজ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তার মানে—প্রজাদের দ্বারাই এ রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। প্রজারা ভোট দিয়েই তাঁদের মনোমত প্রার্থী নির্বাচন করেন। নির্বাচিত ব্যক্তিরা হন জনসাধারণের প্রতিনিধি সারা ভারতে ও রাজ্যে যে রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি বেশী হয়, সেই দলের উপরই ভার পরে সরকার গঠনের। এমনিভাবে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হচ্ছে আদর্শ।

এতে আমরা একদিকে পেয়েছি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার—দেশ পরিচালনার অধিকার। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে আমাদের দায়িত্বও বেড়ে গেছে অনেকখানি। কারণ আমাদের শুভবুদ্ধি ও বিচারশক্তির ওপর নির্ভর করেছে এই বিরাট দেশের শুভ-অশুভ। কাজেই যেদিন এত অধিকার আমরা পেয়েছি, সে দিন আনন্দের তো হবেই—স্মরণীয়ও হবে।

২৬শে জানুয়ারিতে জন্মলাভ করেছে ভারতের সংবিধান। কোন্ আদর্শের উপর ভিত্তি করে কি ভাবে আমাদের দেশ পরিচালিত হবে তা লেখা আছে এই গ্রন্থে—সংবিধানে।

কাজেই সেই সংবিধানের জন্মদিন যে জাতির কাছে আনন্দের হবে, তাতে আর সন্দেহ কি! এই দুই কারণেই ২৬শে জানুয়ারি ভারতের অন্যতম 'জাতীয় দিবস' রূপে গণ্য হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসে আনন্দ উৎসব ছাড়াও অনেকে সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকেন। ভারত সরকারের নির্দেশে এই দুদিন দেশের সর্বশ্রেণীর কর্মচারী সবেতন ছুটি পান।

২রা অক্টোবর তারিখটিও ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ আজ থেকে একশো তিন বছর আগে ১৮৬৯ সালের এই দিনে মহাত্মা গান্ধী জন্মেছিলেন ভারতের মাটিতে। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ভারতে এনেছিল নব-জাগরণ। তাঁর আদর্শ আমাদের দেখিয়েছিল নতুন আলো, নতুন পথ।


বাপুজী

গান্ধীজীর মনোবল ছিল অসীম। নির্যাতনের কাছে মাথা নত না করে অহিংস উপায়ে সারা জীবন ধরে তিনি আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। সে আন্দোলন দেশের মুক্তির আন্দোলন। জাতির

কল্যাণের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাই জাতি তাঁকে 'মহাত্মা' নামে, 'জাতির জনক' নামে অভিহিত করেছে।

মনীষী রাস্কিনের 'আন-টু-দি লাস্ট' নামে একখানি ইংরেজী বই মহাত্মা গান্ধী গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত বইখানির নাম দেন 'সর্বোদয়'। সর্বোদয় কথার অর্থ সকলের উদয়। গান্ধীজীর জীবন-সাধনা ছিল—সকলের মঙ্গলের জন্যে কাজ করা। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কাজ করে গেছেন। তিনি বলে গেছেনঃ অহিংসার সাধকের কর্তব্য হচ্ছে—সকলের সর্বাধিক কল্যাণের চেষ্টা করা।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতের মুক্তি-সাধক। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল তাঁর সাধনার অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে তিনি প্রাণপাত করেছেন। তিনি জানতেন যে ভারতের মত বিরাট দেশের দুঃখমোচন কোন ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ সাধনে হবে না। হবে সকলের সর্বাত্মক কল্যাণ সাধনের মধ্যে দিয়ে। তাই তিনি 'সর্বোদয়' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

এই সর্বোদয় মন্ত্রের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধীর উদয়ের দিন ২রা অক্টোবর। এই দিনটিকে তাই বলা হয় সর্বোদয় দিবস। সবার উদয়ের জন্যেই গান্ধীজী আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার সবার উদয়ের আদর্শ সামনে রেখেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই এ দিনটি ভারতবাসীর কাছে অতি পবিত্র। ভারত সরকার তাই এই দিনটিকেও জাতীয় দিবসের মর্যাদা দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন—জাতীয় উৎসবের দিন, জাতীয় ছুটির দিন বলে।

আমরা যথোচিত মর্যাদা সহকারে প্রতি বছর এই সর্বোদয় দিবস পালন করে থাকি। শপথ করি সর্বোদয়ের আদর্শ গ্রহণ করার।

ভারতের সংগীত

ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকালে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে উন্নত ছিল—তাই নয়, সংগীত চর্চাতেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সাম রব তব তপোবনে।

বৈদিক যুগে ঋগ্বেদ ও সামবেদের স্তোত্রগুলি বিভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা হতো। সেই উদাত্ত সুরে গাওয়া বেদ স্তোত্রগুলিই আদি ভারতীয় সংগীত। তার ছিল এক বিশেষ সুর বৈশিষ্ট্য ; ছিল এক বিশেষ প্রয়োগ পদ্ধতি।

আজ সেই আদি সংগীত লোপ পেয়েছে। অবশ্য এজন্য বৈদিক যুগের মানুষই দায়ী। তাঁরা বলতেন, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধন সংগীতের একটি উদ্দেশ্য—একথা সত্যি ; তবে সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবানের প্রীতিসাধন। কাজেই অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়লে সংগীতের মূল্য খর্ব হতে পারে। সেই ভয়ে তারা স্তোত্র-সংগীতের সুর-ভঙ্গিমাকে গোপন করে রাখতেন। আর এই গোপনীয়তাই আদি সংগীতের লুপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রাচীন ভারতের সংগীত শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। সেই সব গ্রন্থের মধ্যে ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' মতঙ্গ রচিত 'বৃহদ্দেশী', নারদ রচিত 'সংগীত মকরন্দ' ও শার্ঙ্গদেব রচিত 'সংগীত রত্নাকর' উল্লেখযোগ্য। এই সব-গ্রন্থে ভারতীয় সংগীতের

বিভিন্ন স্বর ও লয়ের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতির তেমন উল্লেখ নেই।

ভারতীয় সংগীতের স্বর সাতটি—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। এই সাতটি স্বরের উদ্ভব হয়েছে চারিটি বেদ হতে। ঋক্ বেদ হতে উদ্ভুত স্বর—'সা' এবং 'রে'। সাম হতে উদ্ভূত স্বর—'গা' এবং 'পা'। যজুঃ বেদ হতে উদ্ভূত স্বর—'মা' এবং 'ধা'। আর অথর্ব বেদ হতে 'নি' স্বরটির উদ্ভব হয়েছে।

এই সাতটি স্বরের উদ্ভব সম্পর্কে আরও দুটি মত প্রচলিত আছে। একদল বলেন—পাঁচটি স্বর মহাদেব আবিষ্কার করেছেন; বাকি দুটি পার্বতীর আবিষ্কার। অপর দল বলেন—সাতটি জীবের কণ্ঠস্বর হতে সাতটি স্বর গৃহীত হয়েছে:

ময়ূরের কণ্ঠস্বর হতে	সা
বৃষের কণ্ঠস্বর হতে	রে
ছাগলের কণ্ঠস্বর হতে	গা
বকের কণ্ঠস্বর হতে	মা
কোকিলের কণ্ঠস্বর হতে	পা
ঘোড়ার কণ্ঠস্বর হতে	ধা
হাতির কণ্ঠস্বর হতে	নি

সপ্তস্বরের উদ্ভব সম্পর্কে কোন মতটি ঠিক তা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এই সাতটি স্বরের প্রকৃতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি অতি প্রাচীনকালেই স্থিরীকৃত হয়েছিল।

ভারতীয় সংগীতের এই সাতটি স্বরের সমন্বয়কে 'সপ্তক' বলা হয়। 'সপ্তক' থেকেই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উৎপত্তি। ভারতীয়

সংগীত শাস্ত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে এক একটি বিশেষ রাগ-রাগিণী গাইবার নির্দেশ আছে। যেমন সকালে 'ভৈরবী', দুপুরে 'সারঙ্গ', বিকালে 'মূলতান', সন্ধ্যায় 'পূরবী' ও রাত্রিতে 'বেহাগ'।

বিভিন্ন ঋতুতেও আবার বিভিন্ন রাগ-রাগিণী গাইবার নির্দেশ আছে। যেমন গ্রীষ্মকালে গাইতে হবে 'ভৈরব', বর্ষাকালে 'সেমরাগ', শরৎকালে 'পঞ্চমরাগ', হেমন্তকালে 'নট-নারায়ণরাগ', শীতকালে 'শ্রীরাগ' এবং বসন্তকালে 'বসন্তরাগ'।

ভারতীয় সংগীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার তাল, লয়, মান ও মাত্রা। কাজেই এগুলি সম্পর্কেও একটু আলোচনা করা দরকার।

অখণ্ড কালকে ছন্দের দ্বারা বিভক্ত করাকেই 'তাল' বলা হয়। 'তাল' কতকগুলি মাত্রার সমষ্টি। আর 'মাত্রা' দিয়ে স্বরের স্থায়িত্বকাল নির্দেশ করা হয়। সংগীতের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে 'লয়'। কালের গতিকেই সংগীত শাস্ত্রে লয় বলা হয়। নাচ, গান ও বাজনার প্রাণ হচ্ছে এই লয়। লয় আবার তিন রকম—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। সংগীত শাস্ত্রে তালের বিরাম স্থানের নাম 'মান'। মান আবার চার রকম—সম, বিষম, অতীত ও অনাঘাত।

আবহমান কাল থেকে ভারতীয় সংগীতের দুটি ধারা পাশাপাশি চলে আসছে। একটি লোক-সংগীত বা দেশী-সংগীত, অপরটি শাস্ত্রীয় সংগীত বা মার্গ-সংগীত। শাস্ত্রীয় সংগীত বর্তমানে মার্গ-সংগীত নামে খ্যাত। তবে বর্তমানের মার্গ-সংগীত সেই প্রাচীন শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মার্গ-সংগীত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রীতির উপর নির্ভরশীল মাত্র।

মার্গ-সংগীতের দুই সম্প্রদায়; উত্তর ভারতীয় সংগাত ও কর্ণাটি

সংগীত। উত্তর ভারতীয় সংগীত পারস্য প্রভাবিত ও হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের ফল। বর্তমানে আমরা ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, গজল, টপ্পা প্রভৃতি অনেক রকম গান শুনতে পাই। এই সবই বর্তমান মার্গ-সংগীতে নতুন সংযোজন। মার্গ-সংগীত বলতে বর্তমানে উত্তর ভারতীয় সংগীতকেই বোঝায়। পুরাকালে এই মার্গ-সংগীত ছিল ধর্মীয় সংগীত।

মার্গ-সংগীতের অপর শাখাটি কর্ণাটি সংগীত। কর্ণাটি সংগীতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলিত প্রভাব নেই। আজও কর্ণাটি সংগীত প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের ধারাটি বজায় রেখেছে। এ সংগীতে তাই নতুন কোন সংযোজন হয়নি। কর্ণাটি সংগীতকে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতও বলা হয়।

কয়েকটি মার্গ-সংগীতের পরিচয়

ধ্রুপদ ঃ ভারতে ধ্রুপদ গানের প্রচলন অতি প্রাচীনকাল থেকে। অবশ্য আমরা বর্তমানে যে ধ্রুপদ গান শুনতে পাই তার প্রচলন খিলজী সুলতানের আমলে।

কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সাহায্যে আলাপ করে এই গান শুরু হয়। এ গানে চারটি কলি থাকে। অন্যান্য কলিগুলি গাইবার পর অস্থায়ী কলিটি বার বার গাওয়া হয়। যে কোন রাগেই এ গান গাওয়া যেতে পারে। সাধারণত দেবলীলা, প্রবল সংগ্রাম, রাগকীর্তি প্রভৃতি ধ্রুপদ গানের মাধ্যমে বর্ণিত হয়।

খেয়াল ঃ শোনা যায় খিলজী বংশের আমীর খসরুর আবিষ্কার এই খেয়াল গান। খেয়াল গান মাত্র দুটি কলিতে বিভক্ত। অস্থায়ী ও অন্তরা। সাধারণত অন্তরার সুরেতেই গানটি গাওয়া হয়। গায়ক সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্য স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

ঠুংরী ঃ ঠুংরী এক রকম আবেগ প্রধান গান। এ গান খেয়ালের চেয়ে কিছু হাল্কা ধরনের। হালকা রাগ-রাগিণী এ গানে ব্যবহৃত হয়। ঠুংরীতে একাধিক রাগ-রাগিণী মিশিয়ে সুর ও তালের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। সুর-মাধুরীই ঠুংরী গানের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

টপ্পা : টপ্পাও সংক্ষিপ্ত এবং হালকা ধরনের গান। এতে কথার অংশ অত্যন্ত কম ; তালের অংশ বেশী। এ গান তাল প্রধান। এর বিষয়বস্তু সাধারণত প্রেম বিষয়ক। শোনা যায় লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফ্ উদ্দৌলার সময়ে টপ্পা গানের উৎপত্তি হয়।

লোক-সংগীত ধর্ম-সাধনের জন্যে নয়। অধ্যাত্মভাবেও সমৃদ্ধ নয়। নিছক আনন্দলাভের জন্যই এ সংগীত। অন্তরের আবেগ এ সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

আজকাল আমরা যে সব লোক-সংগীত শুনতে পাই তার উদ্ভব হয়েছে মধ্যযুগে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাই এইসব গানের বিষয়-বস্তু। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ আছে এই সংগীতের। তাই লোক-সংগীত এত জনপ্রিয়। উত্তর প্রদেশের কাওয়ালী, পাঞ্জাবের হীর ও ভাঙ্গ্রা, গুজরাটের মাঁঢ় এবং বাংলার কীর্তন, ভাটিয়ালী, বাউল প্রভৃতি লোক-সংগীত উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি লোক-সংগীতের পরিচয়

কীর্তন : বাংলার একটি মূল্যবান লোক-সংগীত হচ্ছে কীর্তন। কীর্তনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। কীর্তনের বিষয়বস্তু—ভক্তের ভক্তি। আর সেই ভক্তির প্রকাশ হৃদয়ের আবেগে—সুরের মূর্ছনায়। কীর্তনের দুটি রূপ—নাম কীর্তন আর পালা কীর্তন। কীর্তনের সুর ও কলাকৌশল বাংলার নিজস্ব সম্পদ—বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য।

বাউল ঃ পশ্চিম বাংলার কোন কোন অঞ্চলের মাটি রাঙা। বাতাসে ওড়ে গেরুয়া ধুলো। পশ্চিম বাংলায় এমনি এক রাঙা মাটিতেই বাউলের জন্ম। তাই তাদের গানেও একটা উদাস ভাব ফুটে ওঠে।


বাউল

'বাউল' এক বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক। এদের জীবন-যাত্রা পদ্ধতি সহজ ও সংস্কারমুক্ত। এদের বিশ্বাস যে মানুষের দেহেই বাস করেন 'পরম দেবতা'। সে দেবতাকে বাউলরা বলে 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের চেষ্টাই বাউল গানের বৈশিষ্ট্য। বাউল গানে কোন জটিলতা নেই। তবে গানের একটা বৈশিষ্ট্য অঙ্গ নৃত্য। নাচ ও গানের সঙ্গে বাজে হাতের একতারা বা দোতারা যন্ত্র।

ভাটিয়ালী ঃ পূর্ব বাংলা নদীবহুল দেশ। এই দেশের মাটিতেই ভাটিয়ালী গানের পত্তন হয়। ভাটির টানের মত টানাটানি সুর এই গানের। সুরের মধ্যে করুণ ও উদাস ভাব আছে। তবে এ গান মোটেই তত্ত্বমূলক নয়। নীচের ছত্র কটি থেকেই তা বোঝা যাবে ঃ

বিদেশেতে রইলো বন্ধুরে।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখি হ'য়ে উড়ে যাইত।
ও মোর উড়ে যাইয়ে পরতাম বন্ধুর গায়ে রে ॥

রবীন্দ্র সংগীত

সব শেষে রবীন্দ্র-সংগীতের কথা উল্লেখ না করলে ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি প্রায় আড়াই হাজার গান লিখে গেছেন। গানগুলি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি গান সুরধর্মী। কথা সেখানে সুরের বাহন মাত্র। রাগ-সংগীত ধ্রুপদ প্রভৃতি এই পর্যায়ের গান। আবার কতকগুলি গান কাব্যধর্মী। এ গানে কাব্যের প্রয়োজনে সুর ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রেম-সংগীত ও ঋতু-সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লোক-সংগীতগুলিও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। তিনি বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি নানা ধরনের লোক-সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত স্বদেশী সংগীতগুলিও ভারতীয় সংগীতের এক অমূল্য সম্পদ। আমাদের জাতীয় স্তোত্র 'জনগণমন' রবীন্দ্রনাথেরই দান।

রবীন্দ্র-সংগীতে সব শ্রেণীর মানুষেরই মনের খোরাক আছে। শিশু, বৃদ্ধ, ভক্ত, প্রেমিক—সবাই মনের মতন রবীন্দ্র-সংগীত বেছে নিয়ে গাইতে পারে। রবীন্দ্র-সংগীতে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ তো আছেই, আর আছে লৌকিক সুরের মিশ্রণ। সংগাতের শাস্ত্রীয় বিধানকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন। সুর মিশ্রণ রীতির প্রবর্তন করেছেন তাঁর গানে। এই সংমিশ্রণই রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্য সংগীতে বস্তু-প্রধান—ভাব-প্রধান নয়। অপর পক্ষে ভারতীয় সংগীত ভাব ও সুরপ্রধান। আর সব কিছুর অতীত যে আত্মা—ভারতীয় সংগীতে সুর সেই অনন্তের দিকে প্রভাবিত।

ভারতের নৃত্যকলা

নৃত্য বলতে আমরা বুঝি সুদৃশ্য, ছন্দময় এবং নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-সঞ্চালন। সংগীতের মত ভারতীয় নৃত্যও অতি প্রাচীন। ভারতীয় নৃত্যের একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ধারাও আছে। কথিত আছে যে দেবাদিদেব মহাদেব নৃত্যের স্রষ্টা। নৃত্য দুই প্রকার: তাণ্ডব—পুরুষের নৃত্য এবং লাস্য—স্ত্রীলোকের নৃত্য।

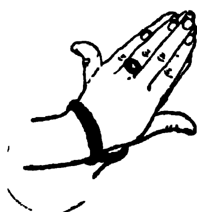
ভারতের নৃত্যকলা অতি প্রাচীন কালেই বেশ উন্নত ছিল। প্রাচীন ভারতের অনেক মন্দিরের গায়ে নৃত্যপরায়ণ দেব-দেবী ও নর্তকীর মূর্তি আঁকা আছে, খোদাই করা আছে। সেগুলি ভারতীয় নৃত্যকলার উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়।

প্রাচীন ভারতের সংগীতের মত নৃত্যেরও উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন। দেবতার প্রীতির জন্য সেকালে নৃত্য অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু কালক্রমে নৃত্যের সেই উদ্দেশ্য ও উন্নত ধারা আজ লুপ্তপ্রায়।

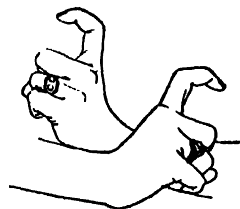
আজ আমরা ভারতীয় নৃত্য বলতে যা বুঝি তা পুনর্জন্ম পাওয়া ভারতীয় নৃত্য। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে এ নৃত্য পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

বর্তমানে ভারতে প্রধানত চার রকম শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার প্রচলন আছে। ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথ্থক ও মণিপুরী। এভিন্ন আছে লোকনৃত্য। শাস্ত্রীয়-নৃত্য দেশের অংশভেদে বিভিন্ন। আর লোক-নৃত্যেরও অসংখ্য বিকাশ।

নৃত্যের আবেগ মানুষের জন্মগত। প্রাণে আবেগের আতিশয্য ঘটলেই মানুষ নৃত্যের প্রেরণা পায়। তখন সে উপকথা, কাহিনী, ইতিহাস, ধর্ম ও প্রেমকে উপজীব্য করে নানা রকমের নৃত্যে প্রবৃত্ত



মৎস্য



ভেরুণ্ডা (পক্ষীযুগ)



শঙ্খ



তাম্রচূড়া (মোরগ ঝুঁটি)

ভারতীয় নৃত্যের কয়েকটি মুদ্রা

হয়। সব নৃত্যই মানুষকে সহজ, সরল ও আনন্দময় করে তোলে। সবারই উদ্দেশ্য এক—আনন্দ ও বিলাস।

কয়েকটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরিচয়

ভরতনাট্যম ঃ গতি এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গী ভরতনাট্যম নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। এককালে দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের মধ্যে এই নৃত্যের খুব বেশী প্রচলন ছিল। দেবদাসীরা দেবতার সামনে এই নাচ নাচতেন। নাচের শুরু হতো 'আহ্বান' মুদ্রার প্রয়োগে। মুদ্রা হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের রীতি।

আবাহনের পর নৃত্যের তালে তালে 'আরাধনা'। সব শেষে 'বরণ'। ভরতনাট্যমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা শুচি ভাব বজায় থাকতো।



ভরতনাট্যম নৃত্য



কথাকলি নৃত্য

কথাকলি : কথাকলি দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় এই নৃত্যের প্রচলন বেশী দেখা যায়।

কথাকলি সমবেত নৃত্য এবং মূক নৃত্য। সাধারণত পুরুষেরাই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কথাকলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পোষাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গী, মুদ্রা ও চোখের ইশারা।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে নৃত্যের মধ্য দিয়ে নাটক অভিনীত হয়। সাধারণত নাটকের বিষয়-বস্তু—রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী। এতে সাধারণত রুদ্র ও বীররসের আধিক্য দেখা যায়।

কথ্‌থক নৃত্য : কথ্‌থক নৃত্য ভারতীয় নৃত্য ও পারসিক নৃত্যের ভাবধারায় প্রভাবিত। নৃত্যশিল্পীর পোষাক-পরিচ্ছদে বহিঃপ্রভাব বেশী

দেখা যায়। অঙ্গভঙ্গী ও চোখের অভিব্যক্তি কথ্‌থক নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার নেই বললেই চলে। তালে তালে পদ সঞ্চালনের জটিলতাও নেই। এই নৃত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চক্রাকারে দ্রুত ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ থেমে যাওয়া। কথ্‌থকে লাস্য ও তাণ্ডব—উভয় নৃত্যেরই চলন আছে।

মণিপুরী নৃত্য: মণিপুরে এক বিশেষ ধরনের নৃত্য-পদ্ধতির প্রচলন আছে; তারই নাম মণিপুরী নৃত্য। নৃত্যের বিষয়-বস্তু ধর্ম-ভিত্তিক। সাধারণত মহাপ্রভু নিত্যানন্দের লীলা, হরপার্বতীর রাসলীলা প্রভৃতি নৃত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়।



মণিপুরী নৃত্য

এ নৃত্যের বেশভূষা অভিনব। মহিলা শিল্পীরা ছোটহাতা ব্লাউজ পরেন। ব্লাউজের হাতায় দু'ইঞ্চি চওড়া জরির কাজ করা থাকে। মাথায় ওঁরা ভেলভেটের টুপী পরেন। ওঁদের কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক রকম ঘাগরায় ঢাকা থাকে। আর পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে চৌকো আর এক রকম ঘাগরায়। ওঁদের গায়ে থাকে হরেক রকমের গহনা।

পুরুষ শিল্পীরা হলুদ রঙের ধুতি পরেন, খালি গায়ে থাকেন। গলায়, মাথায় ও হাতে নানা রকম গহনা পরেন। মাথার মুকুটে ময়ূরের পালক আটকিয়ে রাখেন। মণিপুরী নৃত্যে পা ও চোখ-মুখের বিশেষ

অভিব্যক্তি নেই। সুললিত ছন্দে হস্ত সঞ্চালনের দ্বারাই শিল্পী বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলেন।

লোক-নৃত্য

শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরেই নাম করতে হয় লোক-নৃত্যের। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম লোক-নৃত্যের চলন দেখা যায়। লোক-নৃত্য যৌথ নৃত্য। এতে কোন রকম জটিলতা নেই—আড়ষ্টতা নেই। শিল্পী অঙ্গভঙ্গী সহকারে অতি সহজেই হৃদয়ের আবেগ ফুটিয়ে তোলেন। মনের আনন্দ প্রকাশ করেন। লোক-নৃত্যের সঙ্গে নানা রকমের বাজনা বাজে। বাজনার তালে-তালে শিল্পীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেচে চলেন।

ভারতের অধিবাসীদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব লোক-নৃত্যের ধারা আছে। প্রত্যেক নৃত্যেরই আলাদা-আলাদা নাম। ওরাওঁদের 'কাড়াম', সাঁওতালদের 'বীহা' উড়িষ্যার 'ছৌ' ও মালদার 'গম্ভীরা' লোক-নৃত্য উল্লেখযোগ্য।



গম্ভীরা নৃত্য

সঙ্গীতের মত নৃত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাকে চালু করেছেন। আবার চীন, জাপান, জাভা, রুশ প্রভৃতি দেশের নৃত্যধারাকেও তাঁর নৃত্যনাট্যে প্রয়োগ করেছেন। এককথায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নৃত্য ধারার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। নৃত্যকে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি দিয়ে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

ভারতের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান

ভারত এক বিশাল দেশ। অতি প্রাচীন এ দেশের ইতিহাস। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি এসেছে এ দেশে। বসতি স্থাপন করেছে। অনেকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে।

এই ভারতে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটেছে। তাই ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন। এগুলি দেখার মত জিনিস।

আবার ধর্মের লীলাভূমি ভারত। নানা ধর্মমতের মানুষ এখানে দীর্ঘকাল মিলেমিশে বসবাস করেছে—এখনও করছে। তাই ভারতের সর্বত্রই মন্দির, মসজিদ, মঠ ও গীর্জার ছড়াছড়ি। এদের অনেকেরই গঠন-নৈপুণ্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

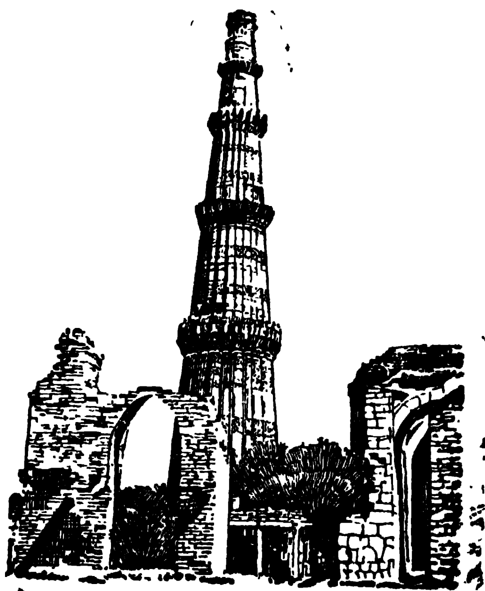
সাম্প্রতিক কালে নব ভারত রূপায়ণের জন্যেও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস গড়ে উঠেছে এ দেশে। ভারতবাসী হিসাবে এই সব স্থান ও বস্তুর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় থাকা দরকার। বিদেশীরাও ভারতে এলে এ সব জিনিস দেখে যেতে ভোলেন না।

ভারতের দর্শনীয় স্থান ও বস্তু সংখ্যায় অনেক। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা এখানে বলা হলো।

১। **দিল্লী:** প্রথমেই নাম করতে হয় রাজধানী দিল্লীর কথা। ১৯১১ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দিল্লীই ভারতের রাজধানী। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে এই দিল্লী নগরীতেই সাতটি সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল।

দিল্লীর ঐতিহাসিক 'লালকেল্লা' সম্রাট সাজাহানের তৈরি। মোগল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক সুন্দর নিদর্শন এই কেল্লাটি। এককালে সম্রাট সাজাহান তাঁর বিখ্যাত ময়ুর-সিংহাসনটি এই কেল্লার মধ্যেই স্থাপন করেছিলেন। দেওয়ান-ই-খাস ও মতি মসজিদ লাল-কেল্লার মধ্যেই অবস্থিত।

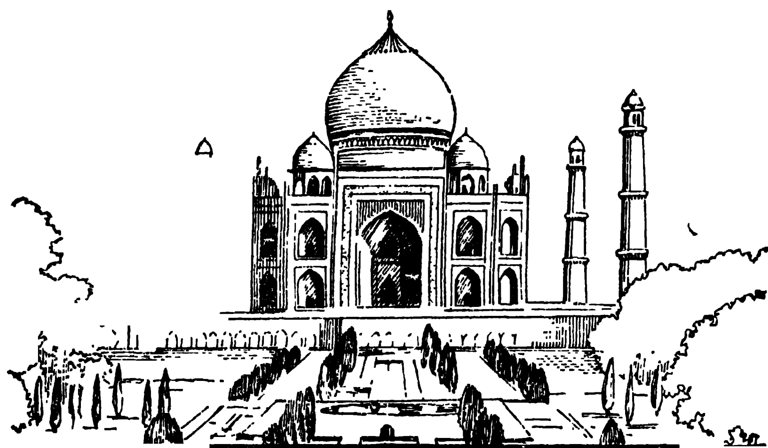
২৩৮ ফুট উঁচু কুতব মিনার—ভারতের বৃহত্তম পাথরে তৈরি মিনার। দিল্লীতে এটি অবস্থিত। ইসলামীয় ধাঁচে গড়া এই মিনার তৈরি করিয়েছিলেন সম্রাট কুতবউদ্দিন আইবাক্। পরবর্তীকালে ইলতুতমিস্ মিনারটিকে আরও বাড়িয়েছিলেন। লাল পাথর ও মার্বেল পাথরে গড়া এই মিনার ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের এক সুন্দর নিদর্শন।


কুতব মিনার

ভারতের সুন্দরতম ও বৃহত্তম মসজিদ জুম্মা মসজিদ দিল্লীর অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। এটিও সম্রাট সাজাহানের তৈরি।

এ ভিন্ন দিল্লীতে গেলে দেখা যাবে হুমায়ুনের কবর, মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল 'রাজঘাট', পণ্ডিত নেহেরুর সমাধিস্থল 'শান্তিবন', পার্লামেণ্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, যন্তর-মন্তর, কালীবাড়ি ইত্যাদি।

২। আগ্রা: আগ্রা শহরটি উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। জগদ্বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ তাজমহলের জন্যে এ স্থানটি বিখ্যাত। তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলেন সম্রাট সাজাহান। সম্রাটের স্ত্রী মমতাজের স্মৃতি রক্ষার জন্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। তাজমহল মুসলমানী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।



তাজমহল

সুন্দর একটি উদ্যানের মাঝে শ্বেতমর্মরে গড়া অপূর্ব কারুকার্য খচিত এই স্মৃতিসৌধ। এটি পৃথিবীর সাতটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম। এর গম্বুজটি উচ্চতায় প্রায় ৩২০ ফুট। এটি নির্মিত হয়েছিল ভারতীয়, তুর্কী ও ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা। বিদেশী পর্যটকেরা ভারতে এলে তাজমহল অবশ্যই দেখে যান।

পুরনো আগ্রা শহর ছিল যমুনা নদীর বাম তীরে। গজনীর সুলতান মামুদ পুরনো আগ্রা শহরটিকে ধ্বংস করেন। বর্তমান আগ্রা শহর স্থাপন করেন সম্রাট আকবর—যমুনার দক্ষিণ তীরে। আকবর

পনেরো বছর ধরে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এখানে একটি সুন্দর দুর্গ নির্মাণ করান। সেই দুর্গই আগ্রা দুর্গ নামে খ্যাত। আগ্রায় গেলে আজও এ দুর্গটি দেখা যাবে।

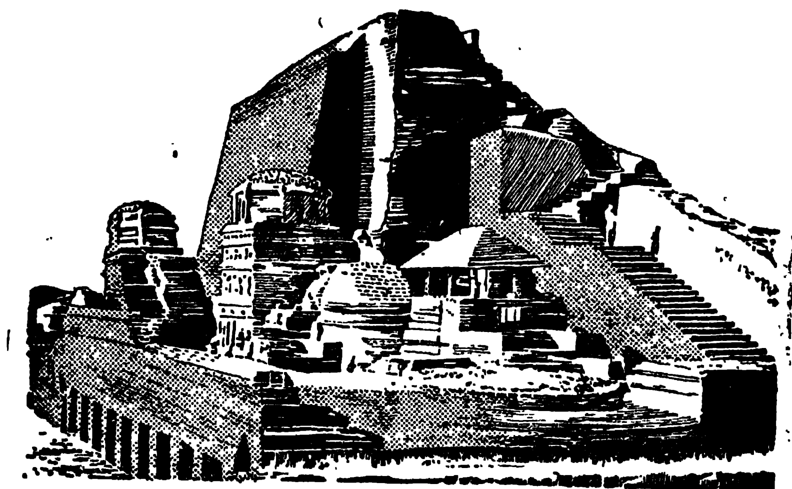
৩। **ফতেপুর-সিক্রি** ঃ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সম্রাট আকবর আগ্রা শহরের তেইশ মাইল পশ্চিমে ফতেপুর-সিক্রিতে তাঁর নতুন রাজধানী নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে ফতেপুর-সিক্রিতে সুন্দর একটি নগর গড়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পনেরো বছর রাজধানী থাকার পর নানান কারণে ফতেপুর-সিক্রি পরিত্যক্ত হয়।

ফতেপুর-সিক্রিতে সম্রাট আকবর অনেক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখানকার অধিকাংশ প্রাসাদই লাল বেলে পাথরে গড়া। খান্দেশ জয় করে সম্রাট সেই কীর্তি স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি এখানে নির্মাণ করিয়েছিলেন ১৭৬ ফুট উঁচু প্রসিদ্ধ 'বুলন্দ্ দরওয়াজা'। এখানকার অন্যান্য দার্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে সাধু সেলিম চিস্তির কবর, পাঁচমহল, হিরন মিনার ও কয়েকটি বৃহদাকার মসজিদ।

৪। **নালন্দা** ঃ 'নালন্দা' বিহারের অন্তর্গত একটি স্থান। বৌদ্ধযুগে এখানে একটি বিরাট মঠ ছিল। আর এই মঠেই গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতেরা ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁদের অধ্যাপনার সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নালন্দায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সেকালে চীন, তাতার, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বহু দূর দেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর সময় নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। ছাত্রদের পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার খরচ

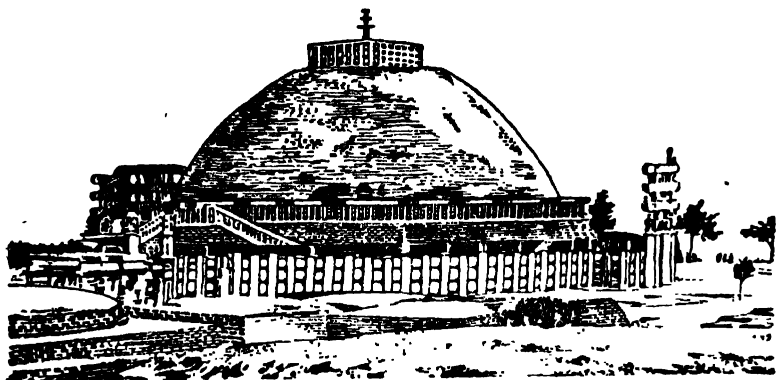
লাগতো না। দেশের ছয়জন রাজা ও কয়েকজন ধনী ব্যক্তি ছাত্রদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন। গুপ্ত যুগের রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীর্ঘ সাতশো বছর ধরে এই মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালু ছিল। তারপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদেশীর আক্রমণে নালন্দা ধ্বংস হয়ে যায়।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

নালন্দার ধ্বংস-স্তূপ খুঁড়ে ঐ মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ঘর-বাড়ি কিছু কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। নালন্দার যে অংশ মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, তা বেশ বড়। বড় রকমের একটি গ্রামের সমান। এখানে কতো মূর্তি, কতো যে স্তূপ পাওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই। শোনা যায় যে মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় একটি ছয়তলা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়িগুলি এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাচীন ভারত যে কতো উন্নত ছিল—নালন্দা তারই সাক্ষ্য দেয়।

৫। **সাঁচিস্তূপ :** ভূপাল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে বৌদ্ধযুগের এক বিখ্যাত স্তূপ—এই সাঁচিস্তূপ। পাথর ও ইট দিয়ে গড়া অর্ধ-গোলকাকৃতি এই স্তূপ ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির



সাঁচিস্তূপ

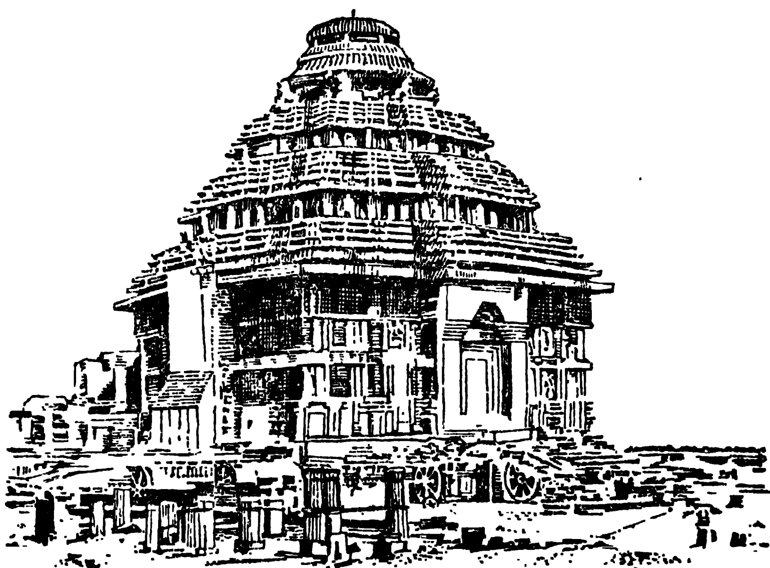
অন্যতম। স্তূপটি একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং পাথরের সুন্দর রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই স্তূপের ব্যাস ১২০ ফুট এবং উচ্চতা ৫৬ ফুট। স্তূপের দরজাগুলিতে জাতক কাহিনীর দৃশ্য খোদাই করা আছে।

৬। **সারনাথ :** সারনাথ উত্তর প্রদেশে—বারাণসী থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। এখানে আছে বিখ্যাত 'মৃগ উদ্যান'। এই উদ্যানে বসেই একদিন গৌতমবুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের শুনিয়েছিলেন নির্বাণ লাভের উপায়।

এখানে একটি অশোক-স্তম্ভও আছে। বেলে পাথরে গড়া এই স্তম্ভ সম্রাট অশোক নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্তম্ভের চূড়ার সিংহমূর্তি-যুক্ত অংশটি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয়-প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

দেড় হাজার বছরেরও আগে সারনাথে অনেক বৌদ্ধ মঠ ছিল। আজ সেগুলি ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানকার একটি স্তূপ বিরাটাকার পাথরে তৈরি। এটির ব্যাস ৯৯ ফুট ও উচ্চতা ১০৪ ফুট। শোনা যায় এইখানেই নাকি ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রথম পাঁচ শিষ্যকে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই সারনাথ বৌদ্ধদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

৭। **কোনারকের সূর্য-মন্দির**ঃ পুরীর উত্তরে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আছে সাতশো বছরের পুরনো কোনারক মন্দির। কথিত আছে



কোনারকের সূর্য-মন্দির

যে একদা এখানে সোনার রথে চড়ে সমুদ্র হতে সূর্যদেবকে উদিত হতে দেখা গিয়েছিল। যে স্থানটিতে দেবতার ছায়া পড়েছিল সেই স্থানে ভক্তেরা এই মন্দির নির্মাণ করেছেন।

মন্দিরের আকৃতি দেবতার রথের মত। সে রথে চব্বিশটি চাকা আছে। রথটি টানার জন্যে আছে সাতটি ঘোড়া। সবই পাথরের তৈরি। আজ এই সূর্য-মন্দিরের কিছুটা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই মন্দিরের শিল্পকলা ও ভাস্কর্য অমর হয়ে আছে।

৮। **অমরনাথ ঃ** ভারতের উত্তরে কাশ্মীর রাজ্য। প্রাকৃতিক শোভার জন্য বিখ্যাত এ রাজ্য। রাজধানী শ্রীনগর ঝিলম নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীনগর থেকে সাতানব্বই মাইল দূরে হিমালয়ের প্রায় সতেরো হাজার ফুট উচ্চে বিখ্যাত 'অমরনাথ মন্দির'—হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান।

এখানে একটি গুহা আছে। গুহার স্থানীয় নাম কৈলাস। অমরগঙ্গা সিন্ধুনদের একটি ক্ষুদ্র উপনদী। গুহার পশ্চিম দিক দিয়ে অমরগঙ্গা প্রবাহিত। এই নদীর পাশ দিয়ে গুহায় যাওয়ার রাস্তা। গুহার ভেতরে শেষপ্রান্তে তুষারলিঙ্গ অমরনাথ। সাপের আকৃতিযুক্ত তুষারপিণ্ডের দ্বারা লিঙ্গ-মূর্তিটি ঘেরা। লিঙ্গ-মূর্তিটির দুইদিকে বরফের দুটি স্তূপ। এদের একটিকে পার্বতী অপরটিকে গণেশের প্রতীক বলে মনে করা হয়। শোনা যায় অমাবস্যার পর থেকে এই তুষারলিঙ্গ ক্রমশ বাড়তে থাকে; পূর্ণিমায় বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। তারপর কৃষ্ণ-পক্ষে প্রতিদিন ঐ লিঙ্গের ক্ষয় হতে থাকে। শেষে অমাবস্যায় লিঙ্গের কোন চিহ্নই নাকি থাকে না। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে বহু যাত্রী এই তীর্থে আসেন পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে।

৯। **উদয়পুর ঃ** উদয়পুর রাজস্থানের একটি শহর। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রানা উদয়সিংহ এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। উদয়পুরের পাহাড় ও হ্রদগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। শহরে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজপ্রাসাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদয়পুরে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী আছে। নদীর গতিপথে

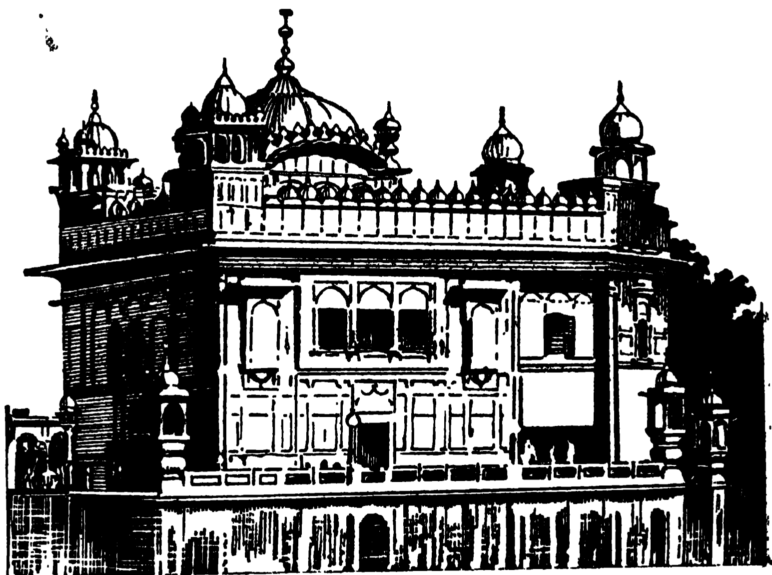
বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি হ্রদ। নাম তার পিছোলা হ্রদ। এই হ্রদের একটি দ্বীপে জগ্‌নিবাস প্রাসাদ। অপর একটি দ্বীপে জগদীশ মন্দির। মন্দিরের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। এ ছাড়াও উদয়পুর শহরে আছে শাহেলিয়োঁ-কি বাগ, সজ্জন-নিবাস বাগ, যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা।

১০। **জয়পুর**ঃ জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী। এ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানকার অধিকাংশ অট্টালিকাই ফিকে লাল রঙের পাথরে তৈরি। জয়পুরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে একটি মানমন্দির, হাওয়ামহল, রামনিবাস উদ্যান, অ্যালবার্ট হল ও যাদুঘর।

জয়পুর রেল স্টেশন থেকে ৬।৭ মাইল উত্তর-পূর্বে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে অম্বর শহর। অম্বর জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এখানে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। তার মধ্যে শ্রীজগৎ সরোমানজীর মন্দির, সীতাদেবীর মন্দির, যশোরেশ্বরী কালী মন্দির ও অম্বিকেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে শিবের অম্বিকেশ্বর নাম থেকেই অম্বর নামের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন যে অযোধ্যায় অম্বরীষ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর নাম থেকেই এই শহরের নাম হয়েছে অম্বর।

অম্বরের শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান হচ্ছে 'অম্বর-রাজপ্রাসাদ'। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহ এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। রাজা প্রথম জয়সিংহের আমলে প্রাসাদের কলেবর বৃদ্ধি পায়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের আমলে অম্বর প্রাসাদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। রাজপুত স্থাপত্যের এক সুন্দর নিদর্শন এই অম্বর প্রসাদ।

১১। অমৃতসর ঃ অমৃতসর পাঞ্জাবের একটি জেলা সদর। শিখদের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র এই অমৃতসর। সম্রাট আকবর শিখগুরু



অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির

রামদাসকে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী সমেত একখণ্ড ভূমি দান করেন। এই ভূমির উপরে রামদাস ভবিষ্যৎ অমৃতসর শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। গুরু রামদাস ক্ষুদ্র জলাশয়টির সংস্কার সাধন করেন। সেটি তখন একটি বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয়। সেই সরোবরের নাম রাখা হয় অমৃত সরোবর। আর এর থেকেই শহরটির নামকরণ হয় 'অমৃতসর'।

এই অমৃতসর শহরেই আছে শিখদের প্রসিদ্ধ 'দরবার সাহেব স্বর্ণমন্দির'। শোনা যায় গুরু অর্জুনের এক মুসলমান শিষ্য ছিলেন। তাঁর নাম 'হজরৎ শেখ মিয়ান মীর'। এই মুসলমান শিষ্যই নাকি স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

এটি হচ্ছে গম্বুজবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ মন্দির। বড় একটি পুষ্করিণীর মাঝে অবস্থিত। মন্দিরের তলার দিকটা মার্বেল পাথর দিয়ে গড়া। উপর দিকটা সোনার পাতে মোড়া তামা দিয়ে ঢাকা। তাই এর নাম স্বর্ণমন্দির। গম্বুজের ভেতর দিকটায় বিদ্রির কাজ শোভা পাচ্ছে। সেখানে শিখগুরুদের জীবনের বিচিত্র ঘটনা চিত্রিত আছে। মন্দিরের ভেতরে জমকালো রেশমী চাঁদোয়ার নীচে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' রাখা আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথে অমর সিংহাসন 'অকাল তখৎ'। এখানে ঐতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র, মণিমুক্তা এবং শিখগুরুদের নানান্ স্মৃতিচিহ্ন রাখা আছে। এই মন্দিরের ভেতরই সেকালে শিখ-গুরুদের দরবার বসতো। তাই এর নাম হয়েছে 'দরবার সাহেব স্বর্ণমন্দির'।

১২। **অজন্তা ঃ** 'অজন্তা' নাম শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শৈলখাত গুহাবলী। এই গুহাবলী ভারতীয় স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন। আর এর অভ্যন্তরভাগের চিত্রাবলী সৌন্দর্যে অতুলনীয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ শহর থেকে প্রায় তেষট্টি মাইল দূরে অজন্তা গুহাবলী। গুহাবলী থেকে অজন্তা গ্রাম সাত মাইল দূরে অবস্থিত। অসমাপ্ত গুহা সহ অজন্তার গুহার সংখ্যা তিরিশ। তার মধ্যে পঁচিশটি সংঘারাম আর পাঁচটি চৈত্যগৃহ। বৌদ্ধ শৈলখাত স্থাপত্য ধারার দু'টি বিশিষ্ট পর্বে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই দুই পর্বতের মধ্যে কিন্তু প্রায় চার শতাব্দীর ব্যবধান। চৈত্যগৃহ হলো দেবালয়; আর সংঘারাম হলো শ্রমণদের সমাবেশের জন্যে তৈরি দরদালান।

অজন্তার গুহাবলীর গায়ে সুন্দর-সুন্দর চিত্র আঁকা আছে। এই চিত্রগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। অজন্তার এই চিত্রগুলিও দু'টি বিভিন্ন সময়ে আঁকা হয়েছিল। এই সময়ের ব্যবধানও খুব দীর্ঘ।


অজন্তার একটি গুহা-চিত্র

গুহাকক্ষের প্রাচীর ও স্তম্ভের চিত্রগুলির বিষয় ধর্মভাবাপন্ন। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব এবং জাতক-কাহিনী অবলম্বনে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত। চিত্রে সে যুগের রাজপ্রাসাদ, কুটির, নগর, গ্রাম, আশ্রম ইত্যাদির জীবন-যাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে। এই চিত্রগুলি সেকালের সামাজিক সংস্কার, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আসবাব-পত্রের প্রামাণিক দলিল বিশেষ।

গুহার ছাদের ভেতর দিকের চিত্র-গুলিও অতীব সুন্দর। তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল, পশু, পাখি, মানুষ প্রভৃতি নিয়ে সেখানে বিচিত্র নকশার সমারোহ। সব চিত্রগুলিতেই স্বাভাবিকতা সজীবতা ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি।

১৩। **ইলোরা**ঃ ঔরঙ্গাবাদ হতে চৌদ্দ মাইল দূরে ইলোরা। পল্লবরাজগণ দক্ষিণ ভারতে আস্ত পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি চালু করেছিলেন। এই রীতির পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল ইলোরার মন্দিরগুলিতে। ইলোরায় মোট চৌত্রিশটি গুহামন্দির আছে। মন্দিরগুলিকে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পাহাড়ের একদিকে বৌদ্ধ মন্দির, অপরদিকে জৈন মন্দির;

আর মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির। মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো কৈলাসনাথের মন্দির। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি ২৭৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৫৪ ফুট প্রস্থ। স্থাপত্য শিল্পের এক অদ্ভুত নিদর্শন এই কৈলাসনাথ মন্দির।

শুধু স্থাপত্যই নয়, ইলোরার ভাস্কর্যও অতি সুন্দর ধরনের। পাহাড়ের গা কেটে ইলোরার গুহাগুলি তৈরি করা হয়েছে। গুহাগুলি খুবই গাম্ভীর্যপুর্ণ। গুহার গায়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনেক কাহিনী খোদাই করা আছে। খোদিত মূর্তিগুলি সজীবতায়, প্রাণ-শক্তিতে ও ভাবগাম্ভীর্যে অতুলনীয়।

১৪। **কলকাতা** ঃ কলকাতা পশ্চিম বাংলার রাজধানী। হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। আজ যেখানে কলকাতা শহর দাঁড়িয়ে আছে, আড়াইশো বছরেরও আগে সেখানে ছিল তিনটি গ্রাম—গোবিন্দপুর, ডিহি কলকাতা ও সূতানুটী। ইংরেজরা এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কেনেন এবং কলকাতা শহরের পত্তন করেন। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা দিবস হচ্ছে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট, রবিবার।

ধীরে ধীরে কলকাতা শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে। আজকের কলকাতা ভারতের অন্যতম বড় শহর। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। তার মধ্যে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, মনুমেণ্ট, যাদুঘর. চিড়িয়াখানা, প্ল্যানেট্যারিয়াম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই কলকাতা শহরেই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। আছে বিজ্ঞান কলেজ ও বসু-বিজ্ঞানমন্দির। আর আছে অনেক স্কুল-কলেজ। এখানকার

দমদম বিমান বন্দর এশিয়ার অন্যতম কর্মচঞ্চল বিমান বন্দর আর ভারতের বৃহৎ বন্দরগুলির মধ্যে কলকাতা অন্যতম।

১৫। **বারাণসী :** বারাণসী উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। এখানে হিন্দু দেব-দেবীর অসংখ্য মন্দির আছে। তার মধ্যে বিশ্বনাথের মন্দির বিখ্যাত। দেবদেবীর পীঠস্থান বলে বারাণসী হিন্দুদের অতি পবিত্র



কাশীর ঘাট

স্থান। 'বার্ধক্যে বারাণসী' বলে একটি প্রবাদ বাক্য আছে। তার অর্থ হিন্দু নর-নারীরা বার্ধক্যে উপনীত হলে বারাণসীতে গিয়ে দেব-দেবীর পূজার্চনায় বাকী জীবনটা কাটাতে পছন্দ করেন। বারাণসী শহরের এক প্রান্তে গঙ্গা নদী। নদীতীরে অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর স্নানের ঘাট আছে। এই ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধ

ঘাট বিখ্যাত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। তার নাম 'বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'।

১৬। **উটকামণ্ড:** উটকামণ্ড মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি জেলায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৭,৫০০ ফিট। দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য শহরগুলির মধ্যে এটি বৃহত্তম। মাদ্রাজ সরকারের গ্রীষ্মাবাস এখানেই অবস্থিত।

ভোডাবেট্টা, স্নোডাউন, এল্‌ক, চার্চ, কেয়ার্ন ইত্যাদি পর্বতঘেরা উপত্যকায় উটকামণ্ড অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ করে। এখানকার জলবায়ু সব সময়েই, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক। গ্রীষ্মকালে উটকামণ্ড ভ্রমণ, শিকার, ঘোড়ায় চড়া ও গল্‌ফ খেলার পক্ষে প্রশস্ত। এখানে ফটোগ্রাফির কাঁচা ফিল্ম উৎপাদনের একটি বড় কারখানা আছে। এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রটি দেখবার মত। এই কেন্দ্রে হিংস্র বন্য জন্তুদের প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখবার সুযোগ আছে।

সারা ভারতে এমনি দেখার মত অনেক জায়গা আছে। তাদের সবার কথা বলতে গেলে ছোটখাট একটি বই লেখা হয়ে যাবে। তাই বেছে বেছে মাত্র কয়েকটি স্থানের কথাই এখানে বলা হলো।

ভারতের জাতীয় পঞ্জিকা

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—আমাদের দেশের এক বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য কাল নিরূপণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। আমাদের দেশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এ দেশে কাল বোঝাবার জন্যে বর্ষ নির্ণয়ের সংখ্যাকে 'অব্দ' বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে এ দেশে বিভিন্ন অব্দ ও যুগের প্রচলন হয়েছে।

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাল-জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে। আর তখন থেকেই কোন না কোন অব্দের ব্যবহার চলে আসছে। ভারতের প্রাচীনতম যুগ হচ্ছে 'কলিযুগ'। এর সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারির সূর্যোদয় থেকে। ঐ সময় থেকে কল্যব্দ গণনা করা হয়। ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্যভট্ট প্রথম কল্যব্দের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তাঁর কালের কলির ৩৬০০ বছর অতীত হয়েছিল। কল্যব্দ সারা ভারতে প্রচলিত। সব পঞ্জিকাতেই এর উল্লেখ দেখা যায়।

'বুদ্ধ-অব্দ' নামে আর এক অব্দ ভারতে প্রচলিত ছিল। এর আরম্ভকাল ৫৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। শোনা যায় যে বুদ্ধের নির্বাণকাল হতে এই অব্দের সূচনা হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা একমত নন। কারো কারো মতে ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন।

বাংলা ছাড়া উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই একটি অব্দের প্রচলন আছে। তার নাম বিক্রম-সংবৎ। আরম্ভকাল ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

শোনা যায় যে বিক্রমাদিত্য নামে উজ্জয়িনীর এক রাজা এই অব্দের প্রবর্তন করেন। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন না। যাই হোক বর্তমানে উত্তর ভারতে চৈত্র শুক্ল-প্রতিপদ থেকে সংবৎ আরম্ভ হয়।

ভারতে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'শকাব্দ' আরম্ভ হয়েছে। আর মুসলমানদের 'হিজরা অব্দ' আরম্ভ হয়েছে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই থেকে। ঐ বছর ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় যান। সেই স্মৃতি রক্ষার জন্যে হিজরা অব্দ প্রবর্তিত হয়েছে। ৩৫৪ দিনে এর এক বছর পূর্ণ হয়।

বর্তমানে বঙ্গাব্দ নামে একটি অব্দের প্রচলন আছে। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের হিজরা সংখ্যা ৯৬৩-র সঙ্গে তার পরের সৌরবছর সংখ্যা যোগ করলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে হর্ষবর্ধনের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি অব্দ প্রচলিত হয়। তার নাম হর্ষাব্দ।

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম অব্দের প্রচলন ছিল। বেশী প্রচলন ছিল সংবৎ ও শকাব্দের। ইংরেজদের আমল থেকে এ দেশে পোপ গ্রেগরীর পঞ্জিকার চলন হয়। এই পঞ্জিকাকে আমরা গ্রেগরীয় পঞ্জিকা বলে থাকি। এই পঞ্জিকায় খ্রীষ্টাব্দ ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টাব্দ গণনা করা হয় যীশু খ্রীষ্টের জন্মকাল হতে। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের প্রচলন হয় যীশুর অনেক পরে—৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

একই দেশে একাধিক পঞ্জিকার চলন থাকলে সরকারী ও বেসরকারী—উভয় কাজেই বিশেষ অসুবিধা হয়। ভারতে সে অসুবিধা দীর্ঘকাল ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই অসুবিধার কথা বিবেচনা

করে ভারত সরকার 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতির সুপারিশে ভারত সরকার একটি 'জাতীয় পঞ্জিকা' গ্রহণ করেছেন। ভারতের জাতীয় পঞ্জিকা শকাব্দের ভিত্তিতে প্রণীত। এতে বছর শুরু হয় ১লা চৈত্র (২২শে মার্চ) থেকে। আর লিপ-ইয়ার ছাড়া সাধারণ বছর ৩৬৫ দিনেই শেষ হয়।

শকাব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্তক। প্রবর্তনের তারিখ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ। শকাব্দ খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বছর পশ্চাদ্বর্তী। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষীরা পঞ্জিকা প্রণয়ন ও ঠিকুজী তৈরির জন্য শকাব্দের তারিখ ব্যবহার করতেন। বরাহমিহিরের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সব জ্যোতিষ-গ্রন্থে শকাব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান ভারত সরকার এই শকাব্দকেই সারা ভারতে ব্যবহারযোগ্য অব্দ হিসাবে গ্রহণ করছেন।

শকাব্দে সাধারণ বছর হয় ৩৬৫ দিনে। আর লিপ ইয়ার হয় ৩৬৬ দিনে। শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করে যোগফল যদি ৪ দ্বারা বিভক্ত হয় তবে সেটি লিপ ইয়ার হবে। কিন্তু ঐ যোগফলটি যদি ১০০-র কোন গুণিতক হয় এবং তা ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবেই লিপ ইয়ার হবে; অন্যথায় হবে সাধারণ বছর।

শকাব্দে বছরের প্রথম মাস হচ্ছে চৈত্র। এ মাসটিতে ৩০ দিন থাকে। কেবল লিপ ইয়ারের ক্ষেত্রে চৈত্র মাস হয় ৩১ দিনে। চৈত্রের পরবর্তী পাঁচ মাস ৩১ দিন করে এবং শেষ ছয় মাস ৩০ দিন করে।

ভারতে দীর্ঘকাল ধরে যে ইংরেজী পঞ্জিকার প্রচলন আছে, তার হিসাব হয় পোপ গ্রেগরীয় পঞ্জিকা অনুসারে। হিসাব করে দেখা গেছে যে শকাব্দের তারিখগুলির সঙ্গে এই গ্রেগরীয় পঞ্জিকার তারিখগুলির একটি স্থায়ী সম্পর্ক আছে। যেমন:—

শকাব্দের তারিখ	গ্রেগরীয় পঞ্জিকার তারিখ
১লা চৈত্র (সাধারণ বছর)	২২শে মার্চ
১লা চৈত্র (লিপ-ইয়ার)	২১শে মার্চ
১লা বৈশাখ	২১শে এপ্রিল
১লা জ্যৈষ্ঠ	২২শে মে
১লা আষাঢ়	২২শে জুন
১লা শ্রাবণ	২৩শে জুলাই
১লা ভাদ্র	২৩শে অগস্ট
১লা আশ্বিন	২৩শে সেপ্টেম্বর
১লা কার্তিক	২৩শে অক্টোবর
১লা অগ্রহায়ণ	২৩শে নভেম্বর
১লা পৌষ	২২শে ডিসেম্বর
১লা মাঘ	২১শে জানুয়ারি
১লা ফাল্গুন	২০শে ফেব্রুয়ারি

ভারতের জাতীয় পঞ্জিকা শকাব্দের ভিত্তিতে রচিত হলেও গ্রেগরীয় পঞ্জিকাকে বাদ দেওয়া হয়নি। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রেগরীয় পঞ্জিকাই ব্যবহৃত হয় আর ভারতকেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রাখতে হয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় পঞ্জিকার শকাব্দের সঙ্গে গ্রেগরীয় পঞ্জিকার খ্রীষ্টাব্দের স্থায়ী ও সহজ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই হিসাবের দিক থেকেও কোন অসুবিধা নেই। এই কারণে ভারত সরকার জাতীয় পঞ্জিকার সঙ্গে গ্রেগরীয় পঞ্জিকাকে চালু রেখেছেন।

ভারত সরকার জাতীয় পঞ্জিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ১৯৫৭ সালের ২২শে মার্চ তারিখে। সেইদিন থেকে সকল সরকারী কাজে জাতীয় পঞ্জিকার তারিখ ব্যবহৃত হচ্ছে।

ধর্মের লীলাভূমি ভারত। ইসলাম, খ্রীস্টান, শিখ, হিন্দু, জৈন, পারসিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বহু ধর্মেরই সহাবস্থান দেখা যায় ভারতে। ভারতে এই ধর্মীয় বৈচিত্র্য ছাড়াও আছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও জাতীয় চেতনা। এসবই উৎসবের উৎস। ভারতে যেমন ধর্মমত বহু, তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতিও বহু। তাই এদেশে উৎসবের এত প্রাচুর্য।

ভারতীয় উৎসবগুলিকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। জাতীয় উৎসব—স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভৃতি;

২। স্মরণোৎসব—বুদ্ধ-জয়ন্তী, গান্ধী-জন্মদিবস, নেতাজী-জন্মদিবস প্রভৃতি ;

৩। ঋতু উৎসব—নবান্ন উৎসব, বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি;

৪। ধর্মীয় উৎসব—দশেরা, ঈদ্, গুরু-পূরব, বসন্ত পঞ্চমী, বড়দিন প্রভৃতি ;

৫। অন্যান্য উৎসব—রাখিবন্ধন, নববর্ষ উৎসব প্রভৃতি।

এই উৎসবগুলির মধ্যে কতকগুলি সারা ভারতেই পালিত হয়, আর কতকগুলি আঞ্চলিক উৎসব। সেগুলির পালন সীমাবদ্ধ থাকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে।

এই অধ্যায়ে ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান উৎসবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

১। **হোলি :** হোলি বসন্তকালের উৎসব। এ উৎসবের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে যে কাহিনীটি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত সেটি এই রকমঃ

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক দুষ্ট রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলের নাম ছিল প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু এবং কাকা হোলিকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ছিলেন ঈশ্বরভক্ত— বিষ্ণুর উপাসক। প্রহ্লাদের এই ঈশ্বরভক্তি হিরণ্যকশিপু ও হোলিকা



হোলি উৎসব

মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁরা প্রহ্লাদকে বিষ্ণুপূজা থেকে নিরস্ত করবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন—এমন কি তাঁর প্রাণ-নাশেরও ভয় দেখিয়েছিলেন। তাতেও কিন্তু ফল হয় নি। প্রহ্লাদ তাঁর আরাধ্য দেবতাকে পরিত্যাগ করেন নি।

অগ্নিতে হোলিকা ছিলেন অমর। সেই সাহসে একদিন তিনি প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিলেন। উদ্দেশ্য—অবাধ্য ছেলে প্রহ্লাদকে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু ফল হলো উল্টো। দেবতার আশীর্বাদে প্রহ্লাদ রয়ে গেলেন অক্ষত আর হোলিকা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

হোলি উৎসবের আগের রাত্রে খড় বা বিচালীর তৈরি হোলিকার প্রতিমূর্তি আগুনে পোড়ানো হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে মন্দ বা অসত্যের বিনাশ সাধন।

হোলি উৎসব রঙের উৎসব। বয়স নির্বিশেষে ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। একে অপরকে আবির মাখিয়ে দেন। পিচকারির সাহায্যে পরস্পরের প্রতি রঙ নিক্ষেপ করেন। মত্ত হয়ে ওঠেন কৌতুকপ্রদ রং খেলায়।

বঙ্গদেশে যে দোল-পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়, তা অনেকটা হোলি উৎসবেরই অনুরূপ। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে আবির লেপন করে তা দোলনায় বসানো হয়। দোলনাটিকে সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা করা হয়। তারপর দোলনা সহ দেবমূর্তি শোভাযাত্রা সহকারে গান গাইতে গাইতে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়।

২। **দশেরা ঃ** সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে সারা ভারতে দশ দিনব্যাপী এক উৎসব পালিত হয়, নাম তার দশেরা। এই উৎসবের প্রথম নয়টি রাত্রিতে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের পূজা হয়।



দশেরা

পুরাকালে দৈত্যরাজ রাবণকে নিধনের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তখন থেকেই নাকি দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।

উত্তর ভারতে দশেরা উৎসব উপলক্ষে নর্তক-নর্তকীরা মুখোশ পরে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিভিন্ন রূপ দান করেন। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁরা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। উৎসবের দশম দিনে কাপড়, পিচবোর্ড, দড়ি প্রভৃতি দিয়ে রাবণ, মেঘনাদ ও কুম্ভকর্ণের বিরাট-বিরাট প্রতিকৃতি গড়া হয় এবং সেগুলি বারুদের সাহায্যে বিস্ফোরিত করা হয়। শ্রীরামচন্দ্র তীর ছুঁড়লে তবেই ঐ দৈত্যের মূর্তিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এর দ্বারা অশুভের উপর শুভের জয় সূচিত হয়। এবং এইটিই দশেরা উৎসবের তাৎপর্য।

৩। দুর্গাপূজা: বঙ্গদেশে শরতের আবির্ভাব হলে হিন্দুর ঘরে-ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। কারণ এইটিই দশভূজা দুর্গাদেবীর অর্চনার সময়।

কথিত আছে, সত্যযুগে রাজা সুরথ রাজ্য লাভের পর প্রথমে এই পূজা করেন। কিন্তু তার পূজা শরৎকালে হয় নি, হয়েছিল বসন্ত কালে। এখন সে পূজা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত। শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্যে দেবীর অকাল-বোধন করেছিলেন। বঙ্গদেশে এই অকাল-বোধনেরই প্রচলন বেশী।

দেবী দুর্গা, তিনি গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা এবং শিবের পত্নী। তিনি দশভূজা। মহিষাসুর বধের সময় এই মূর্তি তিনি ধারণ করেছিলেন। তাই দশভুজা মূর্তিতেই তিনি পূজিতা হন।

দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। তাঁদের মাঝখানটিতে থাকেন দুর্গা দেবী। দেবী সিংহবাহিনী, ত্রিনয়না ও দশভুজা। দশটি হাত দশ দিকে প্রসারিত। দশ হাতে দশটি অস্ত্র। তাঁর পদতলে মহিষাসুর। দেবী মহিষাসুরের কাঁধের উপর বাঁ পা রেখে ত্রিশূল দিয়ে তার বুক বিঁধছেন। দেবীর একপাশে সিদ্ধিদাতা গণেশ

ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী, অন্যপাশে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ও বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী। আর গণেশের পাশে নতুন কাপড়ে ঢাকা নবপত্রিকা। তাঁদের সবার মাঝে অধিষ্ঠিত—দেবাদিদেব মহাদেব।

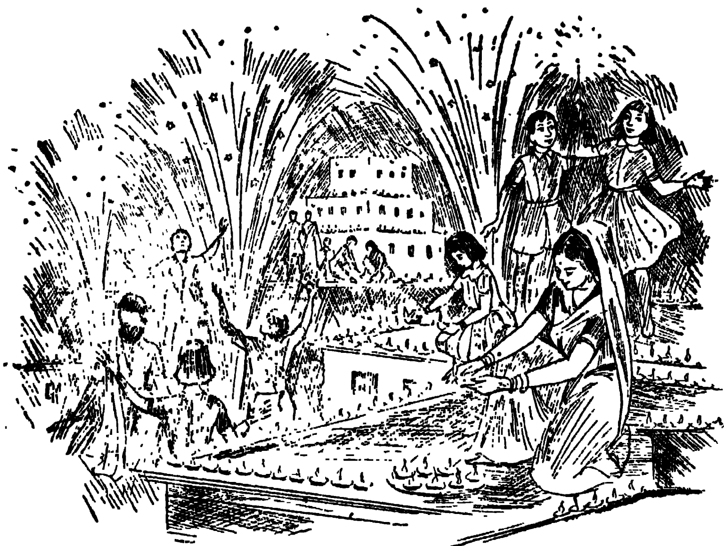


দুর্গোৎসব

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয়। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিন দিন ধরে মহাসমারোহে পূজা হয়। দশমীর দিন হয় দেবীর বিসর্জন। এই দিনটি তাই বিজয়া দশমী নামে খ্যাত। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর হিন্দুরা ঘরে ফিরে এসে পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করেন। এতে সারা বছরের মনোমালিন্য দূর হয়ে যায়—পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব ফিরে আসে।

৪। **দেওয়ালী বা দীপাবলী:** সাধারণত কার্তিক মাসে এই সর্বভারতীয় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। ছোট-বড় নির্বিশেষে সব হিন্দুদের

ঘরেই সেদিন রাতে প্রদীপের আলোকমালা শোভা পায়। এ আলোক মালায় ঘর সাজিয়ে সে রাতে ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে স্বাগত জানানো হয়। দরজার গোড়ায় আঁকা হয় আলপনা।



দেওয়ালী উৎসব

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের নতুন বছরের সূচনা হয় এই দিনটিতে। তাঁরা এই দিনেই নতুন খাতার উদ্বোধন করেন। দেওয়ালী উৎসব শীতের শুভাগমন সূচনা করে। এর পরেই শীতকালীন শস্যের বীজ বোনা হয়। অনেকের মতে দীর্ঘকাল বনবাসে থাকার পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসা উপলক্ষেই এই উৎসব প্রতিপালিত হয়।

৫। **বসন্ত পঞ্চমী:** সাধারণত মাঘ বা ফাল্গুন মাসে এই উৎসব পালিত হয়। এটি প্রধানত উত্তর ভারতের উৎসব—বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তকালে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে

অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম বসন্ত-পঞ্চমী। এই উৎসবের দিনে বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজার্চনা হয়। বঙ্গদেশে এই উৎসব 'সরস্বতী পূজা' নামেই খ্যাত।

এটি প্রধানত ছাত্র ও শিল্পীদের উৎসব। দেবী সরস্বতীর সম্মুখে ছাত্রেরা বই-খাতা-দোয়াত-কলম ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে। শিল্পীরা সাজিয়ে রাখেন তাদের শিল্পের সরঞ্জাম। দেবীর মূর্তি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে পূজা করা হয়। পরদিন শোভাযাত্রা সহকারে সুসজ্জিত দেবী মূর্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী কোন নদী বা জলাশয়ের তীরে। সেখানে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়।

৬। **বুদ্ধজয়ন্তী :** বুদ্ধজয়ন্তী প্রধানত বৌদ্ধদের উৎসব হলেও ভারতের সর্ব ধর্মের লোকই নিষ্ঠাভরে এই উৎসব পালন করেন। উৎসবটি পালিত হয় সাধারণত বৈশাখ মাসে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে বৈশাখের এক পূর্ণিমার দিনে নেপালের লুম্বিনীতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইনিই গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। এঁর জন্মোৎসবই 'বুদ্ধজয়ন্তী'।

৭। **শিবরাত্রি :** ফাল্গুন অথবা চৈত্র মাসে সারা ভারতে শিবরাত্রি উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের রাত্রে হিন্দু নরনারী দেবাদিদেব মহাদেব বা শিবের উপাসনা করেন। কথিত আছে যে, এ রাতে যিনি শিবপূজা করেন—তুষ্ট করতে পারেন দেবাদিদেবকে, তাঁর মোক্ষ লাভ হয়। তাঁকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

৮। **রাখিবন্ধন :** এই উৎসবটি সাধারণত ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পুরাকালে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের একবার খুব যুদ্ধ বাধে। দেবতাদের রাজা তখন ইন্দ্র। ইন্দ্রের স্ত্রী তখন দেবরাজের হাতের কব্জিতে একটি রেশমী রক্ষা-কবচ বা রাখি বেঁধে

দেন। কথিত আছে যে ঐ রাখির গুণেই দেবরাজ নাকি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন।

বর্তমানে এই উৎসবের দিনে ভাই বা ভ্রাতৃস্থানীয়ের হাতে বোনেরা রাখি বেঁধে দেন। উদ্দেশ্য—সব রকম বিপদ হতে ভাইকে রক্ষা করা।

৯। **বড়দিন:** প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সারা ভারতে বড়দিন উৎসব পালিত হয়। এটি খ্রীষ্টানদের একটি ধর্মীয় উৎসব—খ্রীস্ট ধর্মগুরু যীশুর জন্মোৎসব। এই দিনটিতে খ্রীষ্টানদের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আলোকমালায় বাড়ি-ঘর সাজানো হয়। সাজানো গীর্জায় প্রার্থনা শুরু হয় ২৪।২৫ ডিসেম্বরের মধ্য রাত্রি থেকে। আর মহামানব যীশুর আবির্ভাবকে স্বাগত জানাবার জন্যে ধর্মীয় গান গাওয়া হয়।



বড়দিন

১০। **গুড ফ্রাইডে:** খ্রীষ্টানদের আর একটি বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে গুড ফ্রাইডে। মার্চ বা এপ্রিল মাসের একটি শুক্রবারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা যীশু এই দিনটিতে মানব সমাজের মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গ করে-ছিলেন। তাই তাঁর মহান আত্মদানকে স্মরণ

১১। কুম্ভমেলা ঃ প্রতি বারো বছর অন্তর ভারতে কয়েকটি স্থানে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে যে—এই পৃথিবী তার বর্তমান রূপ লাভ করার আগে দেবতা ও অসুরেরা একবার সমুদ্রমন্থন করেছিলেন। সমুদ্রমন্থনের ফলে সমুদ্র থেকে



কুম্ভমেলা

উঠেছিলেন ধন্বন্তরি। তাঁর হাতে ছিল অমৃতপূর্ণ একটি কুম্ভ। কুম্ভের সেই অমৃত লাভ করবার জন্যে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। ফলে বেধেছিল যুদ্ধ।

যুদ্ধের সময় থেকে ফোঁটা ফোঁটা অমৃত পৃথিবীর বারোটি স্থানে পড়েছিল। সেই বারোটি স্থানের মধ্যে ভারতের হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, প্রয়াগ ও নাসিক অন্যতম। তাই ভারতের এই চারিটি স্থানে প্রতি বারো বছর অন্তর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় স্নান করলে পুণ্য সঞ্চয় হয় বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করে। সেকারণ মেলায় বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীর ভিড় হয়।

১২। মহরম : মহরম মুসলমানদের একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব। অতীতের একটি করুণ কাহিনী এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত। সেইজন্যে এটিকে আনন্দোৎসব আখ্যা দেওয়াটা ঠিক নয়। এটি একটি মর্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতি অনুষ্ঠান। আরবীয় বছরের প্রথম মাসের ১০ তারিখে এই শোকাবহ উৎসবটি প্রতিপালিত হয়।



মহরম

ধর্মগুরু মহম্মদের পৌত্র ছিলেন ইমাম হোসেন; সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ রক্ষা করার জন্যে কারবালার বিশাল মরু-প্রান্তরে কূটচক্রী এজিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইমাম হোসেন নিহত হলেন। তাঁর ঐ মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যেই মহরম উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মুসলমানেরা দশ দিন ধরে শোক পালন করেন। পর্বের দিন এবং তার আগের দিন তাঁরা উপবাস ব্রত বা রোজা পালন করেন এবং মৃত মহাপুরুষদের পুণ্য

আত্মার কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। ধর্মশাস্ত্রও পাঠ করেন।

এরপর কারবালার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পুনরভিনয় করবার জন্যে বিরাট শোকযাত্রার এক অনুষ্ঠান হয়। ইমাম হোসেনের সমাধি মন্দিরের অনুকরণে কাগজের তাজিয়া তৈরি করা হয় এবং কল্পিত কারবালায় তা সমাধিস্থ করা হয়। 'হা হোসেন' 'হা হোসেন' বলে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করতে করতে মুসলমানেরা তাজিয়ার শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। এই শোভাযাত্রায় একটি ঘোড়াকে বিশেষভাবে সাজিয়ে সাথে লওয়া হয়। তার নাম 'ছুল ছুল'। 'ছুল ছুল' ইমাম হোসেনের প্রিয় ঘোড়া ছিল।

মহরম একটি বিষাদময় স্মৃতি হলেও একটি মহান্ আদর্শের প্রতীক। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামই এই উৎসবের আদর্শ।

১৩। ইদ্উদ্জুহা বা বকরঈদ: মহরমের মত এটিও মুসলমানদের একটি বড় পর্ব। এই পর্বের পশ্চাতে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হচ্ছে এই—

ভক্ত এব্রাহামকে ঈশ্বর একবার পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন: এব্রাহাম, তোমার পুত্র ইসমাইলকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও, তাতে আমি সুখী হব।

এব্রাহাম প্রসন্নচিত্তেই ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে উদ্যত হলেন। ইসমাইলকে কাপড় দিয়ে ঢেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু সেখানে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। ঘাতক ইসমাইলকে যথারীতি বধ করে ইসমাইলের গায়ে জড়ানো কাপড়-খানি খুললো। কিন্তু কি আশ্চর্য—কোথায় ইসমাইল? তাকে

দেখা গেল তার পিতার পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় আর বধ্যভূমিতে ইসমাইলের পরিবর্তে একটি ভেড়া বধ হয়েছে দেখা গেল। ঐশ্বরিক পরীক্ষায় এব্রাহাম জয়যুক্ত হলেন। তাঁর প্রগাঢ় ঈশ্বর ভক্তির প্রমাণ মিললো। ঈশ্বর তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

ভক্ত এব্রাহামের এই কাহিনী স্মরণ করেই বকরঈদ উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের দিনে মুসলমানেরা ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বধ করেন। তারপর আহারাদির মধ্য দিয়ে আনন্দ সহকারে এই দিনটি উদ্‌যাপন করেন।

১৪। গুরু পূরব ঃ শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরু নানক। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়, আর মৃত্যু হয় ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।



গুরু উৎসব

উপদেশের সাহায্যে তিনি হিন্দু ও ইসলাম—উভয় ধর্মেরই গোঁড়ামী দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই হিন্দু ও মুসলমান—সবারই তিনি সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

গুরু পূরব শিখদের উৎসব। সাধারণত অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দুদিন আগে থেকে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ-সাহেব' পাঠ করা হয়। গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পঠিত হয়। এর নাম অখণ্ড পাঠ।

উৎসবের দিনে গ্রন্থসাহেবকে নিয়ে এক জাঁকজমকপূর্ণ শোভা-যাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি নগর প্রদক্ষিণ করে। শোভা-যাত্রার পুরোভাগে থাকেন পাঁচজন গোঁড়া শিখ। তাঁরা মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে গ্রন্থ-সাহেবের পুরোভাগে থেকে হেঁটে যান।

এ ভিন্ন ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে আর একটি গুরু পূরব উৎসব পালিত হয়। শিখদের দশম ধর্মগুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মোৎসব এটি। শিখরা প্রচুর উৎসাহ ও নিষ্ঠাভরে এই উৎসবটিও পালন করেন।

১৫। **জন্মাষ্টমী**ঃ হিন্দুর উপাস্য দেবতাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অন্যতম। সাধারণত ভাদ্র মাসে উৎসবের রাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উৎসবই জন্মাষ্টমী উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন কেটেছিল মথুরা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। তাই ঐ সব অঞ্চলেই জন্মাষ্টমী মহাসমারোহে পালিত হয় এবং উৎসব পালনের মধ্যে বেশ অভিনবত্ব থাকে।

এ ভিন্ন ভারতে স্বাধীনতা-দিবস ও প্রজাতন্ত্র-দিবস উৎসব সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। এ দুটি ভারতের জাতীয় উৎসব। এই দুই উৎসবের কথা এই গ্রন্থে পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৮৩-৮৭)।

বেদের আদর্শ

কল্পনা করা যাক আদিম মানুষের কথা। আদিম মানুষ আমাদের বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠিতে ছিল অসভ্য; আর ছিল অসহায়। বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে সে ছিল ভীত। তাই আমরা দেখি যে আদিম মানুষ উন্মুক্ত স্থান ছেড়ে গাছের কোটরে ও গিরি-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। ফল-মূল পশু-পাখি খেয়ে পৃথিবীর বুকে এমনিভাবে সে হাজার-হাজার বছর কাটিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু মানব-জীবন গতির প্রকাশ। তার দেহ চায় কাজ। জীবন পথে এগিয়ে যাওয়া তার ধর্ম। তার মন চায় প্রগতি, উন্নতি। সেইটাই হলো মানুষের জীব-ধর্ম। তাই বুদ্ধির উন্মেষ হতেই বিবর্তনের সূত্রপাত হলো। ঘর-বাড়ি, আগুন, চাষ বাস, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার শুরু হলো। তার মনে আত্মীয় ও অনাত্মীয় বোধ জাগলো।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে—একসঙ্গে থাকার প্রেরণা। এই প্রেরণার বশেই আদিম মানুষ দল বেঁধে বাস করতো। নিজেদের দলের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি নিয়েই বাস করতো। কিন্তু তার প্রথম আকর্ষণ ছিল নিজেদের গোষ্ঠীর প্রতি। এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই মানুষের মমতা, সংঘবদ্ধতা ও আরও অনেক বৃত্তি গড়ে উঠেছে। পরিবারে-পরিবারে যেখানে আক্রোশ ছিল সেখানে রক্ত-যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। পরিবার থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে জাতির উদ্ভব হয়েছে। জাতিতে-জাতিতে এই রকম যুদ্ধ বহুবার ঘটেছে।

এমনিভাবে যখনই মানুষের পরিচয় ও সম্পর্কের পরিসর বেড়েছে তখনই কোন না কোন কারণে সংঘর্ষ বেধেছে। আত্মীয়তা ও অনাত্মীয়তাবোধ থেকে স্বদেশী-বিদেশীর সংস্কার মানুষের মনে দানা বেঁধেছে। স্বদেশীয়রা বন্ধু ও বিদেশীয়রা শত্রু—এই ধারণা থেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আদর্শ নিয়েও বহু যুদ্ধ হয়েছে।

ধীরে ধীরে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ থামে নি। এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই পৃথিবীর মানুষ পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। আজও জগতের প্রায় সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে।

সেই আদিম মানুষ ও আজকের মানুষে কতো তফাত! আজকের মানুষের জীবনে এসেছে কতো পরিবর্তন। সকল দেশেই যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। দূরের ঐ গ্রহ-নক্ষত্রদেরও মানুষের তৈরি রকেট আজ নিকট করেছে। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার দিনে দূর বলে আর কিছু নেই। কবিগুরুর ভাষায় বিজ্ঞানকে তাই বলতে হয়ঃ

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই,
কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত জনে দিলে ঠাঁই।

—কবির এ কল্পনা আজ সত্য হয়েছে শুধু বিজ্ঞানের দৌলতেই। কিন্তু দূর নিকট হলেই তো চলবে না, সেই সঙ্গে মানুষের মনের পরিবর্তনও তো হওয়ার দরকার। ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছিঁড়ে মানুষের মনের প্রসারতা আসা দরকার। মানুষের চিন্তাধারাতে আজ

সংকীর্ণতা স্থান পাওয়া উচিত নয়। মানব-মনের এই সংকীর্ণতা দূর করতে হলে—মানব সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হলে দরকার 'বিশ্বরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার।

আজকের দিনে জগতের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অন্য দেশের মঙ্গল-অমঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে। আবার রাজনৈতিক কারণেও আজ আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণে আজ জগতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শান্তি। এ শান্তি আসতে পারে যদি জগতে একটি মাত্র রাষ্ট্র থাকে। আর জগতের সব মানুষ সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়।

বিশ্বের সাধারণ মানুষ চিরদিনই শান্তিতে বসবাস করতে চায়। যুদ্ধ কেহই চায় না। তবুও মাঝে মাঝে আমরা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করি। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে মতবিরোধের জন্যে, স্বার্থের জন্যে, লোভের জন্যে, আদর্শের বিভিন্নতার জন্যে যুদ্ধ হয়। কিন্তু একালের ও সেকালের যুদ্ধে তফাত অনেক। বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ বলীয়ান। সে আজ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। একালের যুদ্ধ কেবল মাত্র দুই-তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। আর সেই বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রও ব্যবহৃত হবে। তাতে গোটা বিশ্ব যাবে ধ্বংস হয়ে। তাই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হলে যুদ্ধ রোধ করতেই হবে। আর যুদ্ধ রোধের একমাত্র উপায়—এক রাষ্ট্র ও এক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

বর্বর মানুষ পরস্পর হানাহানি করেছে। মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আর রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বিরোধ মানুষের প্রগতিকে রুদ্ধ করছে।

মানুষের সভ্যতা আজ উচ্চ গ্রামে উঠেছে। কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ধ্বংসের বীজ। বিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েই মানব-সভ্যতার আজ এত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রাণ যদি প্রীতি ও ভালবাসার রসে ভরে না ওঠে তবেই বিপদ। মনোবিকারের ফলে বিজ্ঞানের সাহায্যেই সে বিশ্বকে ধ্বংস করে বসবে।

তাই আজ দরকার বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের। দরকার বিশ্বজনীনতার। এই বিশ্বই মানুষের একমাত্র রাষ্ট্র। মানুষ মাত্রেই বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক। এই বোধের দরকার। এই বোধ জাগিয়ে তোলার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ'। কিন্তু বিশ্ব-মানবতার আদর্শ আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যত তাড়াতাড়ি তা হয়, ততই বিশ্বের মঙ্গল। মঙ্গল মানব সমাজের।

বিশ্ব-মানবতার এই আদর্শ কিন্তু ভারতের মাটিতেই প্রথম উপ্ত হয়। এ দেশের মাটিতেই সে আদর্শ বিকাশ লাভ করে। আমাদের উপনিষদই বিশ্বের মানুষকে প্রথম উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন; বলেছেন ঃ

॥ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ॥

আমাদের দেশেরই সম্রাট অশোক অস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যজয়ের অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন ধর্ম-বিজয়ের আদর্শ। এ বিজয়ে অস্ত্রের স্থান নেই। আছে প্রেম ও প্রীতির স্থান। ধর্মের বাণী শুনিয়ে, ধর্মোপদেশ দিয়ে বিশ্বের মানুষকে একতা সূত্রে গাঁথাই গার্হস্থ্য ধর্ম-বিজয়ের আদর্শ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বিশ্ব-প্রেমের মহাবাণী শুনিয়েছেন। তাঁর কাব্যের অংশেই বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব-

ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ ফুটে উঠেছে।' কবিগুরু তাঁর 'প্রার্থনা' কবিতায় বলেছেন ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা' নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

আবার আমাদেরই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান করতে বলেছেন শান্তি ও অহিংসার মাধ্যমে। তাঁর সেই শান্তির নীতি, অহিংসার নীতিই পারে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটাতে, পারে সবাইকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডোরে বাঁধতে।

বর্তমান ভারতের আর এক আদর্শবাদী মনীষী—আচার্য বিনোবা ভাবে। তিনিও গাইছেন বিশ্বজনীনতার জয়গান। প্রচার করছেন বিশ্বজনীনতার মূলমন্ত্র ঃ

॥ জয় জগৎ ॥

উপনিষদের সেই উদাত্ত আহ্বান : 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' আজ সফল হোক। তুমি ফরাসী, আমি ভারতীয়, সে নিগ্রো—এ সব জাতিগত পরিচয় ঘুচে যাক। মানুষের একটি মাত্রই জাতিগত পরিচয় থাক :

॥ মানব জাতি ॥

জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি,
সে জাতির নাম মানব জাতি।

—এ কল্পনা সফল হোক।

বিশ্বের প্রতিটি লোকের রোদ, জল, আকাশ, বাতাস—সব কিছু ভোগের সমান অধিকার থাক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান—এ সব ধর্মীয় পরিচয় ঘুচে যাক। সব মানুষেরই ধর্মীয় পরিচয় হোক এক। সবাই পালন করুক :

॥ মানব ধর্ম ॥

যেদিন এ আশা বাস্তবে রূপ নেবে—সেদিন এই মাটির পৃথিবীতে বিরাজ করবে স্বর্গের শান্তি।

ভারতের দুই মহাকাব্য

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলতে মোটামুটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত ভারতীয় সাহিত্যকে বোঝায়। এই সাহিত্যের ইতিহাসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ বৈদিক যুগ এবং বেদের পরবর্তী লৌকিক সাহিত্যের যুগ। রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান নির্দেশ করা হয় বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী স্তরে।

আর্য-অনার্যের ঘাত-প্রতিঘাত, মিলন-মিশ্রণ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর্য সভ্যতার প্রসার ইত্যাদি বহু ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের সামাজিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ। এ দুটি ভারতের জাতীয় মহাকাব্য। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এই দুই মহাগ্রন্থে। যুগ যুগ ধরে এই দুই মহাকাব্য ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অবিচল মহিমায়।

রামায়ণ

বাল্মীকি আদি কবি এবং রামায়ণ তাঁর রচিত মহাকাব্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রচলিত গ্রন্থের সবটা একজনের বা এক সময়ের রচনা নয়। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত যতই হয়ে থাকুক—বহুকাল আগেই তা মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সমগ্র রচনাই এখন বাল্মীকির নামে চলে।

রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত এবং প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোকে

সম্পূর্ণ। আদি কবি বাল্মীকি পাঁচ খণ্ডে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। রচনার ভাষা সংস্কৃত। বাল্মীকির গ্রন্থে রূপকথা ও আরব্য উপন্যাসের মত বিচিত্র অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেক আছে। কাব্যরসও আছে প্রচুর। কিন্তু এর আখ্যানভাগই সাধারণ পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক। বাল্মীকি কথিত এই অতি প্রাচীন আখ্যান আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয়।

পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নারদ মহাকবি বাল্মীকির কাছে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তারপর সবশেষে বলেছিলেন যে, রামরাজ্যে লোকে আনন্দিত হবে, ধর্ম-পরায়ণ হবে, নীরোগ হবে, সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। নারদ কথিত শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বাল্মীকির রামায়ণে। ভারতবর্ষ রামচরিত্রকে লোকোত্তর রূপে গ্রহণ করেছে—গ্রহণ করেছে আদর্শ প্রজাপালকরূপে। তাই ভারতবাসী আদর্শ রাজ্যের নাম দিয়েছে—'রামরাজ্য'।

রামায়ণ পাঠ করলে মনে বল পাওয়া যায়, কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে, প্রতিজ্ঞায় জাগে দৃঢ়তা। সেই সঙ্গে শিক্ষা হয় গুরুজনে ভক্তি করার, আর ধর্মে প্রবৃত্তি; আর জাগে নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ-ধর্ম পালনের প্রবৃত্তি; কাজেই রামায়ণ পাঠ মঙ্গলজনক—চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক।

রামায়নের কাহিনী সংক্ষেপ: সেকালের উত্তর ভারতে অযোধ্যা নামে একটি রাজ্য ছিল। সূর্যবংশীয় রাজারা সেখানে রাজত্ব করতেন। অযোধ্যার রাজা দশরথের তিন স্ত্রী এবং চার পুত্র ছিল। তিন স্ত্রী যথাক্রমে কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা। চার পুত্র যথাক্রমে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হল মিথিলার রাজা জনকের কন্যা সীতাদেবীর। রাজা দশরথের ইচ্ছা ছিল যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে তিনি রাজ্য দেবেন। সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; এমন সময় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। রানী কৈকেয়ীর চাতুরীতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে যেতে হলো। সেই সঙ্গে ঠিক হলো—ভরত হবেন অযোধ্যার রাজা।

হঠাৎ এই ওলট-পালট হয়ে যাওয়াতে বৃদ্ধ রাজা দশরথ মনে বড় আঘাত পেলেন। তিনি দেহত্যাগ করলেন। এদিকে ভরত কিন্তু রাজা হতে রাজী হলেন না। তিনি বনে গেলেন শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে। ভরতের শত অনুনয়-বিনয়েও শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে রাজী হলেন না। রাজী হলেন না রাজ্যে ফিরে যেতে। অগত্যা ভরত অযোধ্যায় ফিরে এলেন—সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শ্রীরামচন্দ্রের খড়মজোড়া। সেই খড়মজোড়া সিংহাসনে রেখে শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছায় ভরত রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

রামচন্দ্র বনবাসে। বনের মাঝে কুঁড়ে ঘরে তিনি ও সীতাদেবী বাস করেন; সেই সঙ্গে ভাই লক্ষ্মণও থাকেন। সুখেই ওদের দিন কাটে। হঠাৎ সেখানে এক অঘটন ঘটে যায়। একদিন লঙ্কার রাজা রাবণ গোপনে এসে সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে যান। অমনি চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়। সীতাদেবীর সন্ধানও মেলে। কিন্তু তাঁকে উদ্ধারের কি উপায়?

রাম-লক্ষ্মণ সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় গেলেন। সঙ্গে গেলেন কিষ্কিন্ধ্যার বীর হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি। ওঁদের সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে রাবণ নিহত হলেন। সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

অযোধ্যায় ফিরে রামচন্দ্রই সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু লোকের মুখে সীতাদেবীর দুর্নাম রটতে লাগলো। তাই শুনে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে আবার বনবাসে পাঠালেন। বনে বাল্মীকি মুনি সীতাদেবীকে আশ্রয় দিলেন। মুনির আশ্রমেই সীতাদেবীর যমজ সন্তান হলো। পুত্র সন্তান দুটির নাম রাখা হলো লব ও কুশ।

লব ও কুশ বাল্মীকির আশ্রমে থেকেই লেখা পড়া আর অস্ত্র চালনা শিখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁরা বড় হয়ে উঠলেন।

এদিকে অযোধ্যার রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তাই শুনে বাল্মীকি মুনি লব ও কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় গেলেন। কৌশলে রামচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন যে লব ও কুশ তাঁরই সন্তান। আর সেই সঙ্গে সীতাদেবীকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

রামচন্দ্র রাজী হলেন। কিন্তু প্রজারা বললেনঃ না, তা কি করে হয়? সীতাদেবী যে নির্দোষ, তিনি যে পবিত্র—তার প্রমাণ কি? অতএব সীতাদেবীকে আগুনে পরীক্ষা দিতে হবে। সীতাদেবী সে কথা জানতে পারলেন। তাঁর লজ্জা হলো, দুঃখ হলো; মনের দুঃখে তিনি পাতালে প্রবেশ করলেন—আর ফিরে এলেন না।

কিছুদিন পর শ্রীরামচন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লব অযোধ্যার রাজা হলেন।

= এই হলো রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী =

মহাভারত

মহাভারত বিশ্ব সাহিত্যের বৃহত্তম কাব্য। এটি অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং প্রায় একলক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মূল মহাভারত রচনা করেন। রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ থেকে ৩০০ অব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে মহাভারত তার বর্তমান রূপ পায়।

মহাভারতকে মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মহাসাগরের বুকে যখন কোন নদী মিশে যায়, তখন সে কোন বিশেষ নাম বা রূপের দ্বারা চিহ্নিত হয় না। মহাভারতের ক্ষেত্রেও এ যুক্তি অনেকটা খাটে। মহাভারতে ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের বহু বিচিত্র ধারা এসে মিলিত হয়েছে। তাই বলা হয়ঃ যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভূ-ভারতে। অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই, সমগ্র পৃথিবীতেও তা নেই।

মহাভারতের কাহিনী-সংক্ষেপঃ পুরাকালে উত্তর ভারতে হস্তিনাপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানে কুরুবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভাই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বড় কিন্তু অন্ধ; তাই ছোট ভাই পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশো ছেলে। তাঁদের বলা হতো কৌরব। আর পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। এঁদের বলা হতো পাণ্ডব।

যুধিষ্ঠির ছিলেন সবার বড়। তাই পাণ্ডুর পরই তাঁরই রাজা হওয়ার কথা। দুর্যোধনের কিন্তু তা ইচ্ছা ছিল না। তিনি এক মতলব আঁটলেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে পাশা খেলার ব্যবস্থা করলেন। এই খেলায় তিনি চালাকি করে পাণ্ডবদের হারিয়ে দিলেন। আর খেলার আগের সর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবদের তখন বারো বছরের জন্য বনে এবং এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে যেতে হলো। আর দুর্যোধন তখন সবটা রাজ্য দখল করে বসলেন।

পাণ্ডবেরা বনে গেলেন। তেরো বছর পরে ফিরলেন বনবাস থেকে। ফিরেই নিজেদের রাজ্য দাবী করলেন। দুর্যোধন কিন্তু তখনও রাজ্য ছাড়তে রাজী হলেন না। ফলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধলো। এই যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণপাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। তুমুলযুদ্ধের পর কৌরবেরা পরাজিত হলেন। যুধিষ্ঠির হলেন রাজা। বহুদিন রাজত্ব করার পর পাণ্ডবেরা তাঁদের বংশধর পরীক্ষিৎকে রাজ্য দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

= এই হলো মহাভারতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী =

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে ভারতে পরবর্তীকালে অনেক কাব্য,নাটক প্রভৃতি রচিত হয়েছে। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের বহু কবি যশস্বী হয়েছেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দেশে শুধু কাব্য-রসিকদেরই রস আস্বাদনের বস্তু হয় নি, এই মহাকাব্য দুখানি আমাদের জাতীয় জীবনকেও বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করেছে।

এই দুই মহাকাব্য আবার ইতিহাসও বটে। কিন্তু যে অর্থে ইতিহাস কথাটির প্রয়োগ হয়, এক্ষেত্রে সে ইতিহাসের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক ইতিহাসের কথা। ভারতের জীবনাদর্শ, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে এই দুই মহাকাব্য পাঠ একান্ত দরকার।

রামায়ণ ও মহাভারত যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছে। ভারতবাসীর চরিত্রকে মহত্তর, উন্নততর ও সুন্দরতর করে তুলেছে। তাই ভারতের এই দুই মহাকাব্যকে না জানলে ভারতকে জানা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

ভারতের প্রমাণকাল

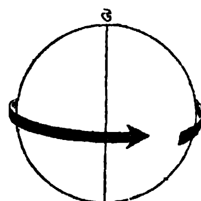
এক ভদ্রলোক এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এলেন। এলেন উড়োজাহাজে চড়ে। উড়োজাহাজ ঠিক সময় কলকাতা পৌঁছুলো। বিমান বন্দর থেকে ভদ্রলোক সোজা চলে গেলেন তাঁর অফিসে। কিন্তু অফিসে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর চব্বিশ মিনিট দেরী হয়ে গেছে।

এই দেরী হওয়ার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, এই দু'জায়গার স্থানীয় সময়ের পার্থক্য। এলাহাবাদের চেয়ে কলকাতার স্থানীয় সময় চব্বিশ মিনিট বেশী। শুধু কলকাতা আর এলাহাবাদ নয়, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় সময় বিভিন্ন। যেমন, কলকাতায় যখন বেলা ১২টা, পুণায় তখন বেলা ১১টা। শুধু ভারত কেন, পৃথিবীর সব দেশেই এই রকম। একই দেশের বিভিন্ন জায়গার স্থানীয় সময় বিভিন্ন।

এ ব্যাপারটা বুঝতে হলে ভূগোলের সামান্য জ্ঞান থাকা দরকার। ভূগোল শাস্ত্রে বলা হয়েছে—আমাদের পৃথিবী একটি বিরাট গোলাকার বস্তু। এই গোলাকার বস্তুটি অবিরাম গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে। লাটিম ঘোরে তার আলের উপর ভর করে। সেরকম পৃথিবী ঘোরে তার অক্ষের উপর ভর করে। লাটিমের আলের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষের তুলনা করা যায়।

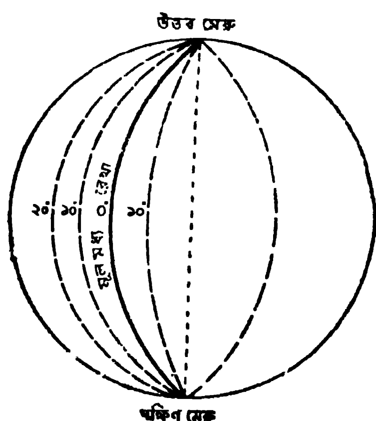
পরের পাতায় ১নং চিত্রটিতে একটি গোলক দেখা যাচ্ছে। ঐ গোলকটিকে পৃথিবী মনে করা যাক। তা যদি হয়, তাহলে 'উ-দ'

রেখাটি হবে পৃথিবীর অক্ষ রেখা। বুঝতে হবে—ঐ রেখাটির চারধারে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাক খেয়ে ঘুরছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে 'উ-দ' রেখাটি গোলকের প্রান্তে দুটি বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। ঐ দুই বিন্দুর নাম মেরুবিন্দু। 'উ' হচ্ছে উত্তর মেরু বা সুমেরু; আর 'দ' হচ্ছে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু।



১নং চিত্র

এখানেই শেষ নয়। পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠে কতকগুলি রেখা কল্পনা করেছেন। ২নং ছবিটি দেখলেই তা বোঝা যাবে। ছবিতে কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার রেখা দেখা যাচ্ছে। এই রেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলির নাম মধ্যরেখা বা দেশান্তর রেখা বা দ্রাঘিমা রেখা।

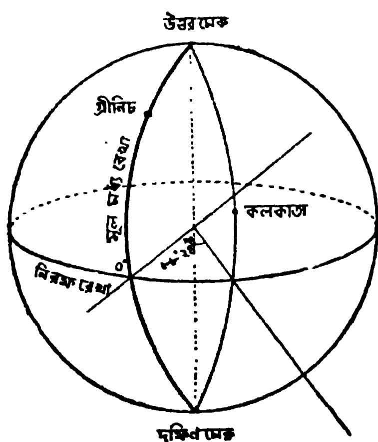


২নং চিত্র

লণ্ডন নগরীর কাছে 'গ্রীনিচ' নামে একটি শহর আছে। একটি কাল্পনিক মধ্য-রেখা এই গ্রীনিচ শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছে। এটির নাম মূল মধ্যরেখা। এই মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন জায়গার

কৌণিক দূরত্বকে বলে ঐ জায়গার দেশান্তর। সাধারণ কোণের মত ডিগ্রী, মিনিট, সেকেণ্ড প্রভৃতির দ্বারা এই কৌণিক দূরত্ব মাপা হয়।

এই মাত্র যে কৌণিক দূরত্বের কথা বলা হলো তার ধারণাটা আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার। হয়তো বলা হলো—কলকাতার দেশান্তর ৮৮°২৪´ পূর্ব (৮৮ ডিগ্রী ২৪ মিনিট পূর্ব)। এর মানে কি?—



৩নং চিত্র

মানে হচ্ছে কলকাতার ওপর দিয়ে যে মধ্যরেখা গিয়েছে তা নিরক্ষরেখাকে ছেদ করেছে। অনুরূপ ভাবে মূল-মধ্যরেখাটিও নিরক্ষরেখাকে ছেদ করেছে। এখন কল্পনা করা যাক যে, নিরক্ষরেখার উপর এই দুই ছেদ বিন্দু হতে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত দুইটি ব্যাসার্ধ টানা হল এবং এর ফলে যে কোণের সৃষ্টি—তার পরিমাণ ৮৮°২৪´ পূর্ব। তিন নম্বর ছবিটি দেখলেই এ ব্যাপারটি বোঝা যাবে। এই ছবিতে কলকাতা শহরের দেশান্তর মাপার পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে পৃথিবী তার অক্ষের ওপর ভর করে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর সূর্য বরাবরই কিরণ দিচ্ছে স্থিরভাবে। পৃথিবীর গায়ে কাল্পনিক মধ্যরেখাগুলি আঁকা আছে। পৃথিবী ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যরেখাগুলি প্রত্যেকে একের পর এক—একবার করে সূর্যের সামনে আসছে, আবার ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

সব মধ্যরেখাগুলি একই সময়ে সূর্যের সামনে আসে না।

কোন জায়গার মধ্যরেখা যখন সূর্যের ঠিক সামনে আসে তখন ঐ মধ্যরেখার ঠিক ওপরে থাকে সূর্য। তখন সে জায়গায় মধ্যাহ্ন হয়। আর সেখানকার ঘড়িতে তখন বেলা ১২টা বেজেছে বলে ধরা হয়। তখন সেই মধ্যরেখার ওপর সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান হয়। এইভাবে আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান দেখে যে সময় স্থির করা হয়—তারই নাম 'স্থানীয় সময়'।

কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই বিভিন্ন জায়গার মধ্যরেখা আলাদা। তাই একই দেশের বিভিন্ন জায়গার স্থানীয় সময় আলাদা। দিল্লী, কলকাতা, লখ্‌নৌ, কানপুর, পাটনা, শিলং—সব শহরের স্থানীয় সময় আলাদা। সেজন্যে যাতায়াত, খবর আদান-প্রদান ও অন্যান্য কাজ-কর্মের অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই দরকার হয় 'প্রমাণকাল'-এর।

সাধারণত কোন দেশের মাঝামাঝি অবস্থানের কোন জায়গার স্থানীয় সময়কে ঐ দেশের সব জায়গার স্থানীয় সময় বলে ধরা হয়। এরই নাম 'প্রমাণকাল'—ইংরেজীতে বলে 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম'।

এখন কথা হচ্ছে, ভারতের প্রমাণকাল বলতে কি বুঝব? ভারতের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় আছে এলাহাবাদ। এলাহাবাদ ৮২$\frac{১}{২}^{\circ}$ ডিগ্রী পূর্ব দেশান্তরে অবস্থিত। এখানে যখন বেলা ১২টা হবে, সারা ভারতে তখন বেলা ১২টা ধরা হবে। ভারত সরকারের এটাই নিয়ম। কাজেই ভারতের প্রমাণকাল হচ্ছে ৮২$\frac{১}{২}^{\circ}$ ডিগ্রী পূর্ব দেশান্তরের সময়।

ভারতের ডাক ও তার বিভাগ, যানবাহন, বেতার অনুষ্ঠান, অফিস-আদালত—সবই চলে এই প্রমাণকাল অনুযায়ী। স্থানীয় সময় ভারতের কোথাও ব্যবহৃত হয় না।

পৃথিবীর সব দেশেই এমনিভাবে একটি করে প্রমাণকাল স্থির করা হয়েছ। কিন্তু সব দেশের প্রমাণকালের মধ্যে তফাৎ আছে। নীচের দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ঃ

কলকাতায় যখন সোমবার বেলা ১২টা তখন—

(ক) লণ্ডনে সোমবার সকাল ৬টা বেজে ৫৪ মিনিট ;

(খ) বার্লিনে সোমবার সকাল ৭টা বেজে ৭ মিনিট ;

(গ) নিউ ইয়র্কে রবিবার রাত্রি ১টা বেজে ৭ মিনিট ;

(ঘ) টোকিওতে সোমবার বিকেল ৩টা বেজে ৭ মিনিট।

আগেই বলা হয়েছে যে লণ্ডনের কাছে আছে গ্রীনিচ শহর। গ্রীনিচের ওপর দিয়ে ০° ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখা। এই শূন্য ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখার সময়কে পৃথিবীর সব জায়গার প্রমাণকাল বা গ্রীনিচ-প্রমাণকাল হিসাবে ধরা হয়। আমাদের দেশের প্রমাণকালের চেয়ে এই গ্রীনিচ প্রমাণকাল প্রায় ৫ ঘণ্টা ৬ মিনিট কম।

যখনই আমরা কোন দেশের সময়ের কথা বলি, তখনই বোঝায় সে দেশের প্রমাণকালের কথা। কাজেই ভারতীয় সময় বললে ভারতের প্রমাণকালকেই বোঝাবে। ভারতের যেখানেই যিনি থাকুক না কেন, সবার ঘড়িতে একই সময় দেখা যাবে—এ সময় ভারতীয় প্রমাণকাল।

ভারতের জাতীয় পক্ষী

আ...শে যখন বর্ষার কালো মেঘ জমে, তখন ময়ূর পেখম মেলে। ...মরা মুগ্ধ হয়ে তা দেখি আর বলি ঃ ময়ূর কত সুন্দর! সত্যই তাই। ময়ূরের মত সুন্দর পাখি ভারতে নেই বললেই চলে।

ভারতের একমাত্র সুন্দরবন ছাড়া আর প্রায় সব জায়গাতেই ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়া জেলায় ময়ূর আছে। ভারত ছাড়া সিংহল, জাভা ও মালয় দেশেও এ পাখি দেখা যায়। কিন্তু ভারতে ময়ূর ও মানুষের সম্বন্ধ যেন চিরকালের।

এককালে রাজার রাজপ্রাসাদের শোভা বাড়াতো ময়ূর। রাজবাগানে থাকতো কত শত পোষা ময়ূর। মুনিদের তপোবনেও ঘুরে বেড়াতো ময়ূর। আমাদের তাঁতের কাপড়ে, তামা-পিতল কাঁসার বাসনে থাকতো ময়ূরের নক্সা। বাদশা-বেগমদেরও প্রিয় ছিল ময়ূর। সম্রাট সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসন ছিল জগদ্বিখ্যাত। ময়ূরের মত গড়ন, মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরি অতি সুন্দর সেই ময়ূর-সিংহাসন।

হিন্দুদের দেব-দেবীরও ময়ূর না হলে চলে না। শ্রীকৃষ্ণের মাথার মুকুটে আছে ময়ূরপুচ্ছ। আবার কার্তিকের বাহনও ময়ূর। ময়ূর আমাদের প্রিয় পাখি বলেই সেই পৌরাণিক যুগ থেকে এর সঙ্গে আমাদের অতি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ময়ূরকে জাতীয় পক্ষীর মর্যাদা দেওয়ার এও একটি অন্যতম কারণ।

ভারত সরকার ময়ূরকে জাতীয় পক্ষী হিসাবে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ১৯৬৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে। জাতীয় পক্ষী হিসাবে ময়ূরকে মনোনীত করার পিছনে চার দফা যুক্তি আছে :

১। ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, লোক-কাহিনী এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ময়ূরের দীর্ঘকালের সম্পর্ক আছে ;

২। ময়ূরের অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য, তার সম্ভ্রান্ত ও লাবণ্যময় চেহারা সকলের মন ভোলায় ;

৩। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ময়ূর খুব জনপ্রিয় ; আর

৪। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই ময়ূর বাস করে।

যাই হোক জাতীয় পক্ষী ময়ূর ভারতের পক্ষীকুলের প্রতিনিধি। একে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

লেজ বাদে ময়ূরের দেহ প্রায় চার ফুট লম্বা। লেজটি লম্বায় প্রায় দেহেরই সমান। লেজে মোট আঠারটি পালক আছে। ডানা দুটি বেশ লম্বা। ঠোঁট শক্ত, তবে একটু বাঁকা। ওজন কম-বেশী পাঁচ কিলোগ্রাম। ময়ূরের চেয়ে ময়ুরী আকারে একটু ছোট হয়। পুরুষ ময়ূরের মাথায় থাকে শিখা। সেইজন্য ময়ূরের অপর নাম 'শিখী'। ময়ূর-ময়ূরীর রঙে কিছু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ভালভাবে না দেখলে বোঝা যায় না।

নদীর ধারের বনে অথবা আশেপাশে পাহাড় আছে এমন বনে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। থাকে খুব সতর্ক হয়ে। হিংস্র জন্তু বিশেষ করে বাঘ দেখলে এরা অত্যন্ত চঞ্চল হয় এবং সোরগোল করতে থাকে। ফলে মানুষ ও নিরীহ পশু-পাখীরা সাবধান হওয়ার সুযোগ পায়। এরা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে জোরে ছুটতে পারে তবে উড়তে পারে কম।

সকাল ও সন্ধ্যায় ময়ূর মাঠে চরতে বেরোয়। উত্যক্ত হলে উড়ে উঁচু গাছের ডালে বসে। জঙ্গলের কাছে ধান অথবা অন্য কোন শস্যক্ষেত্র থাকলে ওরা সেখানে চরে বেড়ায়। ওদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে বিভিন্ন শস্য। তবে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ এবং ছোটখাট সরীসৃপও এরা খায়। রাত্রিবেলায় ঘন পাতায় ঢাকা গাছের ডালে বসে থাকে ময়ূর।

ময়ূর নদী-নালার কাছে ঘন ঘাসে বা লতাগুল্মে ঢাকা জমিতে বাসা বানায়। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ওপরটা ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। এই বাসায় এবং কখনও বা বড় গাছের কোটরে ময়ূরী ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় মার্চ অথবা এপ্রিল মাস। এক সঙ্গে চার থেকে ছটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা এবং দু'ইঞ্চি চওড়া। রং দুধের সরের মত। তাতে কখনও কখনও পীত বা গোলাপী আভা থাকে।

পুরাণে আছে—একবার রাক্ষসরাজ রাবণের ভয়ে দেবতারা ছদ্মবেশ ধারণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র নেন ময়ূরের রূপ। এইভাবে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে দেবতারা প্রাণে বাঁচেন। ইন্দ্র ময়ূরের রূপ ধারণ করে রক্ষা পেয়েছিলেন বলে খুশী হয়ে ময়ূরকে বর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ তোমার সাপের ভয় থাকবে না। আর আমার হাজারটা চোখ তোমার পুচ্ছে থাকবে। তুমি দেখতে সুন্দর হবে। আর আমি যখন আকাশে মেঘ দেব, বৃষ্টি দেব—তখন তুমি আমায় দেখে নাচবে। বর্ষা দেখে তাই নাকি ময়ূর পেখম মেলে নাচে।

ময়ূর দেখতে সুন্দর বটে, তবে এর ডাক মোটেই মধুর নয়—কর্কশ।

ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব

ভারত আমাদের দেশ। আমরা এ দেশের নাগরিক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে কতকগুলি ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব চোখে পড়ে। আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করি।

প্রথমেই আসা যাক ভারতের আয়তনের কথায়। এ দেশ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় বত্রিশ'শ কিলোমিটার বিস্তৃত। আর পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত তিন হাজার কিলোমিটার। সমগ্র দেশটির আয়তন ৩২,৭৪,৬০০ বর্গ-কি·মি.। আমাদের দেশ পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। এত বড় দেশের মানুষ আমরা!

আমাদের দেশের জনসংখ্যাও কম নয়। ১৯৫৩ সালের লোক-গণনার হিসাব অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন কোটি। শেষ লোক গণনার পর আরও এক বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা আরও কিছু বেড়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগই আমরা—ভারতীয়রা।

মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ভারত একটি উপদ্বীপ। আর এটি পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ।

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা আমাদের দেশেরই উত্তরাংশে অবস্থিত। নাম তার হিমালয়। এই পর্বতমালারই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে 'এভারেস্ট'। এভারেস্ট উচ্চতায় ৮,৮৪৮ মিটার অর্থাৎ ২৯,০২৮ ফুট। এত উঁচু পর্বতশৃঙ্গ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

দীর্ঘকাল ধরে মানুষ এভারেস্ট শৃঙ্গকে জয় করার চেষ্টা করেছে। এই জয়ের চেষ্টায় অসাফল্য এসেছে বহুবার। কিন্তু মানুষ তার হাল ছাড়েনি। বার বার অভিযান চালিয়েছে। শেষে সাফল্য এসেছে।

১৯৫৩ সালের ২৯শে মে তারিখটিকে পৃথিবীর মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না। কারণ ঐ দিনই বৃটিশ অভিযাত্রী দলের দু'জন পর্বতারোহী এভারেস্ট শিখরে প্রথম আরোহণ করেন। সেই দু'জনের একজন আবার ভারতীয়—নাম তেনজিং নোরগে।

ভারতের জলবায়ুতেও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে রাজস্থান। বৃষ্টিপাত এখানে খুবই কম। আবার এই ভারতেরই উত্তর-পূর্বদিকে আসাম রাজ্য। এ রাজ্যের চেরাপুঞ্জী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বর্ষণ-মুখর স্থান। ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে এখানে ৩৬৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। একমাসে এত বৃষ্টি-পাতের নজির পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী ভাষা অন্যতম। হিন্দীতে কথা বলেন পৃথিবীর প্রায় ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ। এই হিসাবে হিন্দী ভাষাকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা আখ্যা দেওয়া যায়।

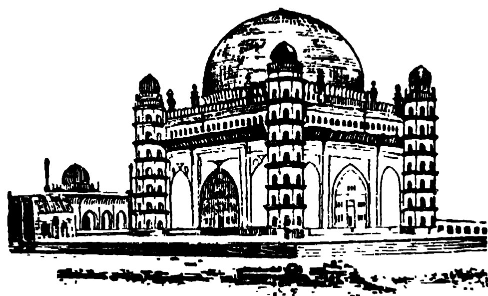
পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ আমাদের দেশেই অবস্থিত। পশ্চিম বাংলার 'সুন্দরবন ব-দ্বীপ'এর আয়তন আট হাজার বর্গমাইল। এত বড় ব-দ্বীপ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কাশ্মীরের একটি স্থানের নাম লাডাক। লাডাকে একটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র আছে। সেটি ১৪,২৩০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এত উঁচু বিমান অবতরণ-ক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর গভীরতম খনি—সেই আমাদের ভারতেই। মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি জগদ্বিখ্যাত। এই কোলার স্বর্ণখনির একটি অংশের নাম ওরগাঁও। এখানে খনির গভীরতা দশ হাজার ফুট। এত গভীর খনি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে শোনপুর প্ল্যাটফর্ম। সেটি আমাদের দেশেই অবস্থিত। প্ল্যাটফর্মটি দৈর্ঘ্যে ২,৪১৫ ফুট। আবার পৃথিবীর চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু আমাদের দেশেই অবস্থিত। নাম শোন সেতু—দৈর্ঘ্যে ৯,৮৪০ ফুট।

পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজটি আমাদের দেশেই অবস্থিত। এটি আছে দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরে। নাম গোলগম্বুজ। উচ্চতায় ১৯৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। ১৮,১১০ বর্গ ফুট পরিমিত ভূমির উপর গম্বুজটি অবস্থিত। এদিক থেকে বিচার করলে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজ। ১৬৫৬ সালে সুলতান মামুদ আদিল সাহ্ এটি নির্মাণ করেছিলেন।

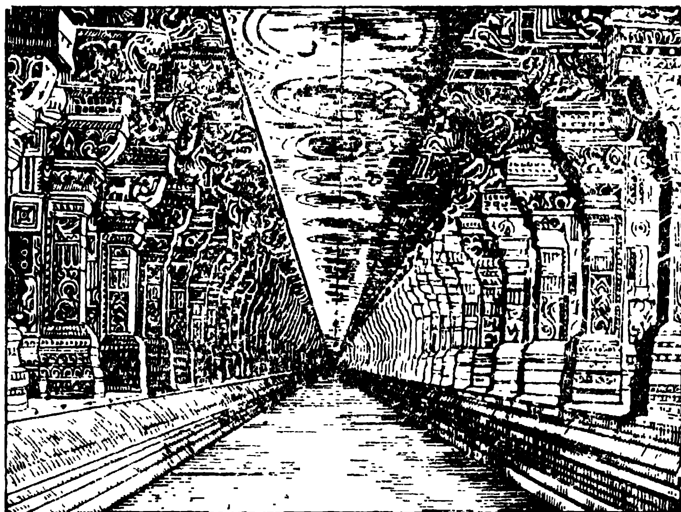


গোলগম্বুজ

পাঞ্জাবের ভাক্রায় শতদ্রু নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এই বাঁধটির উচ্চতা ৭৪০ ফুট। এটি দৈর্ঘ্যে ১,৭০০ ফুট ও প্রস্থে ১,১০০ ফুট। এটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ।

আগ্রার তাজমহল পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের একটি, এর সৌন্দর্য জগদ্বিখ্যাত। এ স্মৃতিসৌধের কথা আগেই বলা হয়েছে (১০২ পৃষ্ঠায়)।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বরম শহর। এই শহরেই আছে শ্রীরামনাথস্বামীর মন্দির। সংক্ষেপে একে আমরা রামেশ্বরম মন্দির বলে থাকি। মন্দিরটি নির্মিত হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। দ্রাবিড় শিল্পরীতির এটি একটি সুন্দর নিদর্শন।



রামেশ্বরম

চতুষ্কোণ এই মন্দিরটি সাড়ে ছ'শ ফুট প্রশস্ত ও এক হাজার ফুট দীর্ঘ। স্তম্ভযুক্ত এই মন্দিরের দরদালান প্রায় চার হাজার ফুট দীর্ঘ। এত দীর্ঘ দরদালান পৃথিবীর কোথাও নেই।

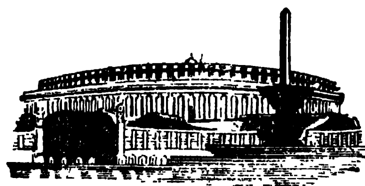
ভারত কৃষি প্রধান দেশ। প্রায় সব রকমের ফসলই ফলে এ দেশে। তবে কয়েকটি ফসলের ফলনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন আখ। পৃথিবীর সব দেশের চাইতে আমাদের দেশে আখ বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আখের রস থেকে তৈরি হয় গুড় ও চিনি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুড় তৈরি হয় এদেশে।

তূলা উৎপাদনের দিক থেকেও আমরা ভাগ্যবান। তূলা উৎপাদনে আমেরিকার স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। তারপর রাশিয়া। ভারত হচ্ছে তৃতীয়। আবার চীনাবাদাম, অন্যান্য তৈলবীজ ও লাক্ষা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। সবার প্রিয় পানীয় যে চা—তাও আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। চা সবচেয়ে বেশী জন্মে চীন দেশে। তারপরই নাম করতে হয় ভারতের। তামাক উৎপাদনেও ভারতের স্থান দ্বিতীয়—আমেরিকার পরেই।

খনিজ সম্পদেও ভারত বেশ সমৃদ্ধ। অভ্র হচ্ছে কাচের মত স্বচ্ছ জিনিস—কিন্তু ধাতু নয়। নানারকম শিল্প কাজে এ জিনিসটির প্রয়োজন হয়। আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভ্র পাওয়া যায় আমাদেরই দেশে।

ম্যাঙ্গানিজ ধাতুটি নানান্ শিল্প কাজে লাগে। আমাদের দেশে এ ধাতুটিও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়।

এমনিভাবে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলে নানা ক্ষেত্রেই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব চোখে পড়বে। ভারতবাসী হিসাবে এই সব শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমাদের জানা উচিত।





বন্দে মাতরম্ ।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং,
সুখদাং বরদাং মাতরম্

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট